প্রধান শব্দসমূহ : প্রজনন, নিষেক, পার্থেনোজেনেসিস, সংকরায়ন।

দশম অধ্যায়

উদ্ভিদ প্রজনন

PLANT REPRODUCTION

মাধ্যমিক শ্রেণিতে তোমরা জীবের প্রজনন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা লাভ করেছো, বিশেষ করে পুষ্পক উদ্ভিদের প্রজনন অঙ্গ, ফুলের গঠন, পরাগায়ন, গ্যামিট সৃষ্টি, নিষেক এবং ফল ও বীজ উৎপাদন বিষয়ে জেনেছো। এ অধ্যায়ে বিষয়টি আর একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় পাঠশেষে শিক্ষার্থীরা—

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে—	পাঠ পরিকল্পনা	
❖ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া।	পাঠ ১	যৌন প্রজনন
❖ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা।	পাঠ ২	অযৌন প্রজনন
❖ কৃত্রিম প্রজননের ধারণা।	পাঠ ৩	উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ জনন
❖ কৃত্রিম প্রজননের উপায় হিসেবে উদ্ভিদের সংকরায়ন।	পাঠ ৪	উদ্ভিদ সংকরায়ন
❖ কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব।		

প্রজনন জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। জড় বস্তুর প্রজনন ক্ষমতা নেই। প্রতিটি জীবেরই তার অনুরূপ বংশধর সৃষ্টির প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে। কাঁঠালের বীজ থেকে কাঁঠাল চারা, আমের বীজ থেকে আম চারা হয় যা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পরিপূর্ণ কাঁঠাল গাছ ও আম গাছে পরিণত হয়। একই ভাবে কলা গাছের গোড়া থেকে কলার চারা (সাকার), বাঁশ গাছের গোড়া থেকে বাঁশের চারা (সাকার) যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে পূর্ণাঙ্গ কলা গাছ ও বাঁশ গাছে পরিণত হয়। শিমুল, সজিনা, মাদার, জীয়ল ইত্যাদি গাছের ডাল কেটে মাটিতে লাগালে সেই ডাল সজীব হয়ে পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হয়। পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলে তার কিনার থেকে নতুন পাথরকুচি চারা সৃষ্টি হয়। **মাতৃ উদ্ভিদ থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই উদ্ভিদের প্রজনন প্রক্রিয়া।** যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীব তার অনুরূপ অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে সেই **প্রক্রিয়াকে প্রজনন** বলা হয়। এ অধ্যায়ে উদ্ভিদের প্রজনন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

MENINGES
Academic And Admission Care

ভ্রূণ সৃষ্টি, তার বিকাশ ও প্রকাশই উদ্ভিদের যৌন প্রজননের মূল উদ্দেশ্য। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের ভ্রূণ সৃষ্টি ও বিকাশের বৈজ্ঞানিক আলোচনাই **উদ্ভিদ ভ্রূণবিজ্ঞান** বা Plant Embryology। Embryo-এর বাংলা হলো ভ্রূণ।

প্রজননের প্রকারভেদ : উদ্ভিদে বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন উপায়গুলোকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। যৌন প্রজনন এবং ২। অযৌন প্রজনন। এছাড়া কোনো কোনো উদ্ভিদে অন্য এক ধরনের প্রজনন দেখা যায় যা পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংজনি নামে পরিচিত।

আবৃতবীজী উদ্ভিদে যৌন প্রজনন (Sexual Reproduction of Angiosperm)

আবৃতবীজী উদ্ভিদে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় ডিম্বকে, ডিম্বক সৃষ্টি হয় ফুলের স্ত্রীকেশরের গর্ভাশয়ে। শুক্রাণু সৃষ্টি হয় পরাগরেণুতে, পরাগরেণু সৃষ্টি হয় ফুলের পুংকেশরের পরাগধানীতে। কাজেই ফুলই আবৃতবীজী উদ্ভিদে জননাঙ্গ ধারণ করে। **ফুল হলো উদ্ভিদের বংশবিস্তারের (প্রজননের) জন্য বিশেষভাবে রূপান্তরিত বিটপ (shoot)।**

১। যৌন প্রজনন (Sexual reproduction) : দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির গ্যামিটের (পুং এবং স্ত্রী গ্যামিট) মিলনের মাধ্যমে যে প্রজনন প্রক্রিয়ার সূচনা হয় তাই যৌন প্রজনন। যৌন প্রজননের মাধ্যমে সবীজী উদ্ভিদে বীজের সৃষ্টি হয়, তাই বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াই যৌন প্রজনন। আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন উগ্যামাস ধরনের।

রেণুস্থলী বা পরাগরেণুর পরিস্ফুটন (Development of Microsporangia) : ফুলের তৃতীয় স্তবক হলো পুংজনন স্তবক। এক বা একাধিক পুংকেশর নিয়ে এ স্তবক গঠিত। প্রতিটি পুংকেশর নিচে দণ্ডাকার **পুংদণ্ড** (filament) এবং মাথায় স্ফীত **পরাগধানী** (anther) নিয়ে গঠিত। পরাগধানীর দুটি খণ্ডের মাঝখানে একটি **যোজনী** (connective) থাকে।

পরিণত পরাগধানী (anther) অনেকটা চারকোণাবিশিষ্ট হয়। প্রতি কোণে ভেতরের দিকে কিছু কোষ আশপাশের কোষ হতে আকারে বড়ো হয়। এদের ঘন সাইটোপ্লাজম এবং বড়ো নিউক্লিয়াস থাকে। এসব কোষকে আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (archesporial cell) বলা হয়। এ কোষ প্রজাতিভেদে সংখ্যায় এক থেকে একাধিক থাকতে পারে। আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ বিভাজিত হয়ে পরিধির দিকে দেয়ালকোষ এবং কেন্দ্রের দিকে প্রাথমিক জননকোষে (primary sporogenous cell) পরিণত হয়। দেয়ালকোষ হতে পরে ৩–৫ স্তরবিশিষ্ট প্রাচীর গঠিত হয়। পরাগধানীর প্রাচীর ঘেরা এ অংশকে **পরাগথলি** (pollen sac) বলে। প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তর হলো ট্যাপেটাম।

পরাগধানীর আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (2n) → দেয়াল কোষ (2n) → প্রাচীর গঠন

পরাগধানীর আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (2n) → প্রাথমিক জনন কোষ (2n) → পরাগমাতৃ কোষ (2n) —মায়োসিস→ পরাগরেণু (n) (৪টি)

প্রাথমিক জননকোষ পরাগমাতৃকোষ হিসেবে কাজ করতে পারে অথবা বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো পরাগমাতৃকোষে পরিণত হতে পারে। পরাগমাতৃকোষে তখন মায়োসিস (meiosis) বিভাজন হয়, ফলে প্রতিটি ডিপ্লয়েড (2n) পরাগমাতৃকোষ হতে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) পরাগরেণুর সৃষ্টি হয়। পরাগরেণু বিভিন্ন বর্ণের হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত হলুদ বর্ণের হয়। ট্যাপেটাম (tapetum) বিগলিত হয়ে পরিস্ফুটিত পরাগরেণুর পুষ্টি সাধন করে। পরাগমাতৃকোষ হতে সৃষ্ট চারটি পরাগরেণু বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে, চারটি পরাগরেণু একসাথে হালকাভাবে লাগানো অবস্থায় থাকে যাকে পরাগ চতুষ্টয় বা পোলেন টেট্রাড (Pollen tetrad) বলে। তবে পরিণত অবস্থায় পরাগরেণুগুলো পরস্পর আলাদা হয়ে যায়। Orchidaceae, Asclepiadaceae এসব গোত্রের উদ্ভিদের পরাগরেণু পৃথক না হয়ে একসাথে থাকে। একসাথে থাকা পরাগরেণুগুলোর এ বিশেষ গঠনকে পলিনিয়াম (pollinium) বলে।

MENINGES
Academic And Admission Care

পরাগরেণুর গঠন : পরাগরেণু সাধারণত গোলাকার, ডিম্বাকার ও ত্রিভুজাকার হয় এবং এদের ব্যাস ১০ থেকে ২০০ μm পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি পরাগরেণু এককোষী, এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এবং হ্যাপ্লয়েড। প্রতিটি পরাগরেণুর দুটি ত্বক থাকে। বাইরের ত্বকটি কিউটিনযুক্ত, পুরু ও শক্ত। এটি বহিঃত্বক বা এক্সাইন (axine) নামে পরিচিত। এক্সাইন বিভিন্নভাবে অর্নামেন্টেড থাকে। এক্সাইন-এ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান থাকে, প্রধান উপাদান হলো স্পোরোপোলেনিন। ভেতরের ত্বকটি

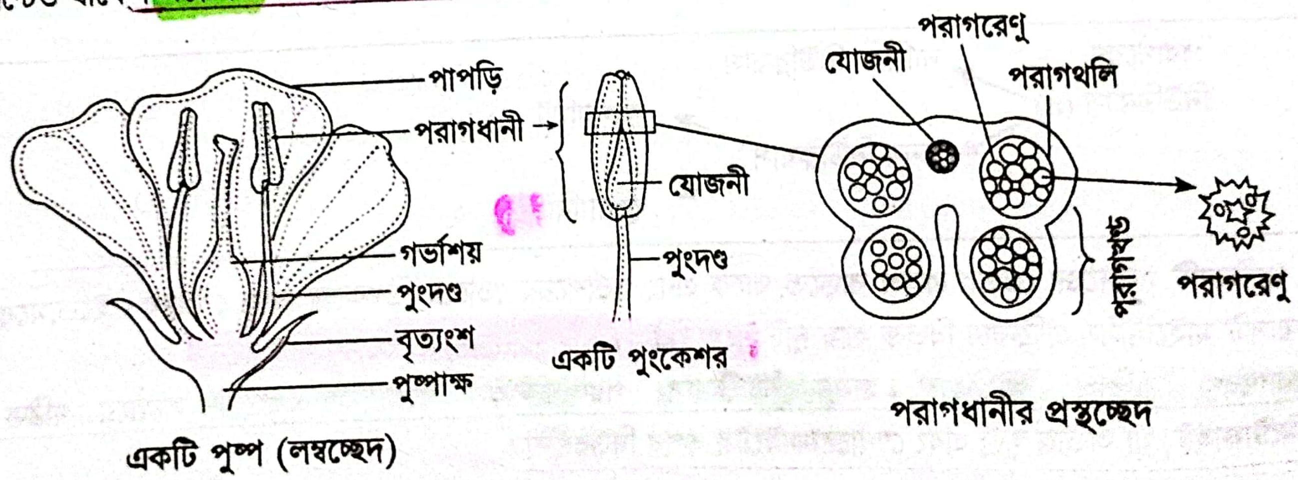

চিত্র ১০.১ : একটি পুষ্প (লম্বচ্ছেদ), একটি পুংকেশর, পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ এবং একটি পরাগরেণু।

বেশ পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত। এর নাম অন্তঃত্বক বা ইনটাইন (intine)। এক্সাইন (বহিঃত্বক) স্থানে স্থানে অত্যন্ত পাতলা থাকে, পাতলা ছিদ্রের ন্যায় অংশকে জনন ছিদ্র, রেণুরন্ধ্র বা জার্মপোর (germpore) বলে (চিত্র-১০.২)। একটি

পরাগরেণুতে সাধারণত একাধিক জার্মপোর (২০টি পর্যন্ত) থাকে। পরাগরেণুর সাইটোপ্লাজম ঘন থাকে এবং প্রথম পর্যায়ে নিউক্লিয়াসটি মাঝখানে থাকে। পরিণত অবস্থায় কোষগহ্বর সৃষ্টির ফলে নিউক্লিয়াসটি এক দিকে সরে আসে।

পুংগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of male gametophyte) ও গঠন : পরাগরেণু(n) হলো পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। পরাগরেণুর নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয়ে দুটি অসম নিউক্লিয়াস গঠন করে। বড়োটিকে

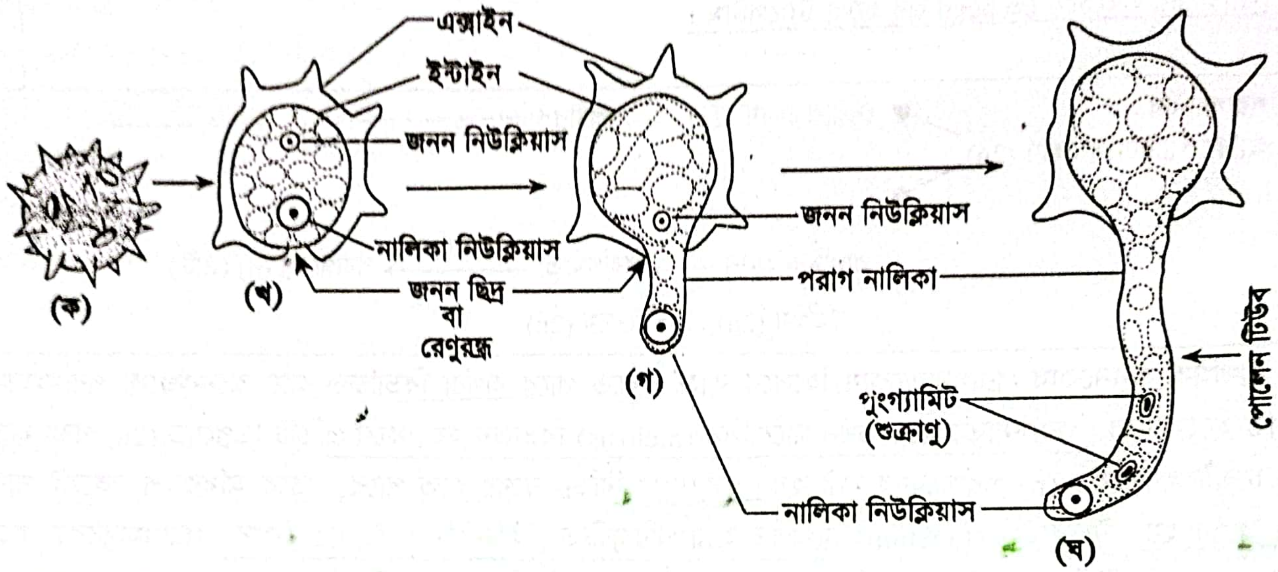

চিত্র ১০.২: (ক) পরাগরেণু, (খ–গ) পুংগ্যামিটোফাইট সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ এবং (ঘ) পুংগ্যামিটোফাইট।

বলা হয় নালিকা নিউক্লিয়াস (tube nucleus) এবং ছোটোটিকে বলা হয় জনন নিউক্লিয়াস (generative nucleus)। পরাগধানীর প্রাচীর ফেটে গেলে সাধারণত এ দ্বি-নিউক্লিয়াস অবস্থায় পরাগরেণু বের হয়ে আসে এবং পরাগায়ন (Pollination) সংঘটিত হয়। পরাগরেণুর পরবর্তী ধাপসমূহ পরাগ নালিকার মধ্যে ঘটে থাকে। উদ্ভিদে পরাগায়নের কারণে কোনো তরল পদার্থ (পানি) ছাড়াই নিষেক (fertilization) সম্ভব হয়। পরাগায়নের মাধ্যমে পরাগরেণু স্ত্রীকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় এবং অঙ্কুরিত হয় অর্থাৎ ইনটাইন বৃদ্ধি পেয়ে জার্মপোর (জননছিদ্র) দিয়ে নালিকার আকারে বাড়তে থাকে। এ নালিকাকে পোলেন টিউব (pollen tube) বা পরাগনালিকা বলে। পরাগনালিকার ভেতরে নালিকা নিউক্লিয়াস এবং পরে জনন নিউক্লিয়াস প্রবেশ

পরাগরেণু নিউক্লিয়াস (n) → নালিকা নিউক্লিয়াস
পরাগরেণু নিউক্লিয়াস (n) → জনন নিউক্লিয়াস → পুংগ্যামিট (n)-১
জনন নিউক্লিয়াস → পুংগ্যামিট (n) -২

করে। নালিকাটি গর্ভদণ্ডের ভেতর ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বকরন্ধ্র পর্যন্ত পৌছায়। ইতোমধ্যে জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি পুংগ্যামিট (male gamete) বা শুক্রাণু সৃষ্টি করে।

পরাগরেণু, নালিকা নিউক্লিয়াস, জনন নিউক্লিয়াস, পরাগনালিকা, পুংগ্যামিট–এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হলো পুংগ্যামিটোফাইট, যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং স্পোরোফাইটের ওপর নির্ভরশীল।

ডিম্বকের পরিস্ফুটন (Development of ovule) : ডিম্বক হলো ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরস্থ একটি অংশ যা মাতৃজননকোষ সৃষ্টি করে এবং নিষেকের পর বীজে পরিণত হয়। ডিম্বক (ovule) সৃষ্টি হয় গর্ভাশয়ের ভেতরে অমরা (placenta) হতে। প্রথমে অমরাতে একটি ছোটো স্ফীত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়। স্ফীত অঞ্চলটি ক্রমে ডিম্বকে পরিণত হয়। প্রথম পর্যায়ে

MENINGES Academic And Admission Care

ডিম্বকের টিস্যুকে মূলত দুটি ভাগে চিহ্নিত করা যায়– চারপাশের আবরণ টিস্যু এবং মাঝের নিউসেলাস (nucellus) টিস্যু। পরবর্তী পর্যায়ে বাইরের আবরণটির নিচে আর একটি আবরণ তৈরি হয়। বাইরের আবরণটি বহিঃত্বক এবং ভেতরেরটি অন্তঃত্বক হিসেবে পরিচিত। ডিম্বকের অগ্রভাগে নিউসেলাসের একটু অংশ অনাবৃত থাকে, কারণ ত্বক এ অংশকে আবৃত করে না। এটি একটি ছিদ্রপথ বিশেষ, যাকে **মাইক্রোপাইল** (micropile) বা **ডিম্বকরন্ধ্র বলা হয়**। ডিম্বকরন্ধ্রের কাছাকাছি নিউসেলাস টিস্যুতে একটি কোষ আকারে বড়ো হয়। এর নিউক্লিয়াসটিও আকারে অপেক্ষাকৃত বড়ো থাকে এবং কোষটি ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। এ কোষকে প্রাইমারি আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (primary archesporial cell) বলে। **আর্কিস্পোরিয়্যাল** কোষটি বিভক্ত হয়ে একটি **দেয়ালকোষ** এবং একটি **প্রাথমিক জননকোষ** (primary sporogenous cell) সৃষ্টি করতে পারে অথবা সরাসরি **স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ** (megaspore mother cell) হিসেবে কাজ করে।

ডিম্বকের আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (2n) → দেয়াল কোষ (2n)
ডিম্বকের আর্কিস্পোরিয়্যাল কোষ (2n) → প্রাথমিক জননকোষ (2n) → স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ(2n) —মায়োসিস→ স্ত্রীরেণু (n) ৪টি (১টি কর্মক্ষম)

ডিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু (megaspore) তৈরি করে। চারটি স্ত্রীরেণুর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং একটি (নিচেরটি) কার্যকর হয়।

ডিম্বকের গঠন : একটি ডিম্বক (megasporangium = ovule) নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে গঠিত:

১। **ডিম্বকনাড়ী (Funiculus) :** ডিম্বকের বোঁটার ন্যায় অংশকে ডিম্বকনাড়ী বলা হয়। এ বোঁটার সাহায্যে ডিম্বক অমরার সাথে সংযুক্ত থাকে। কোনো কোনো প্রজাতিতে ডিম্বকনাড়ী ডিম্বকত্বকের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত থেকে শিরার মতো গঠন করে। এ যুক্ত অংশকে **র‍্যাফি** (raphe) বলে।

২। **ডিম্বকনাভী (Hilum) :** ডিম্বকের যে অংশের সাথে ডিম্বকনাড়ী সংযুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকনাভী বলে।

৩। **নিউসেলাস (Nucellus) বা ভ্রূণপোষক টিস্যু:** ত্বক দিয়ে ঘেরা প্রধান টিস্যুই হলো নিউসেলাস।

৪। **ডিম্বকত্বক (Integument) :** নিউসেলাসের বাইরের আবরণীকেই ডিম্বকত্বক বলা হয়। সাধারণত এটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট।

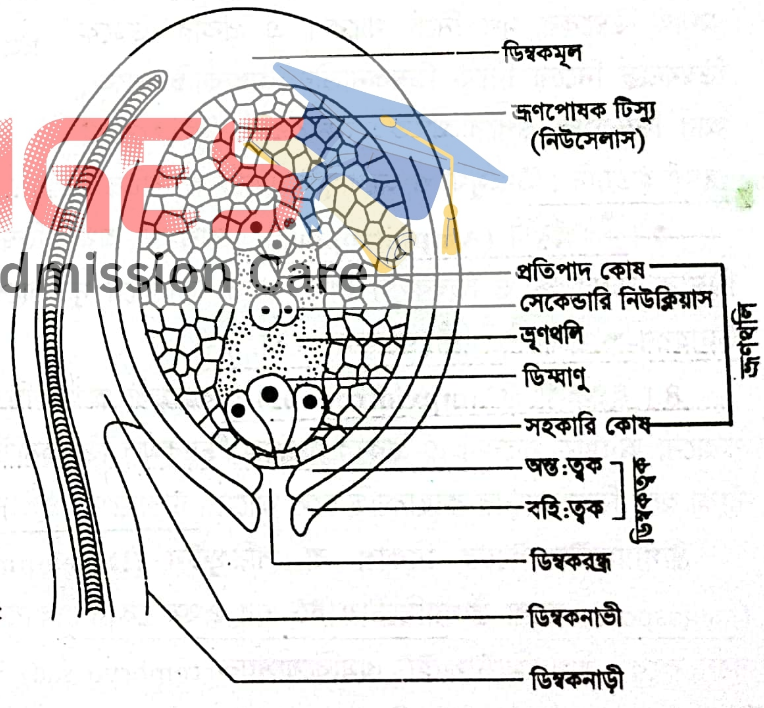

চিত্র ১০.৩ : ডিম্বকের গঠন (নিম্নমুখী বা অধোমুখী ডিম্বকের লম্বচ্ছেদ)।

MENINGES Academic And Admission Care

৫। **ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle) :** ডিম্বকের অগ্রপ্রান্তে ত্বকের ছিদ্র অংশই ডিম্বকরন্ধ্র বা মাইক্রোপাইল।

৬। **ডিম্বকমূল (Chalaza) :** ডিম্বকের গোড়ার অংশ, যেখান থেকে ত্বকের সূচনা হয়, তাকে ডিম্বকমূল বলে।

৭। **ভ্রূণথলি (Embryo sac) :** নিউসেলাসের মধ্যে অবস্থিত থলির ন্যায় অংশকে ভ্রূণথলি বলে।

ভ্রূণথলি নিম্নবর্ণিত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।

(ক) **গর্ভযন্ত্র (Egg-apparatus) :** ডিম্বকরন্ধ্রের সন্নিকটে তিনটি কোষ দিয়ে গঠিত ভ্রূণথলির অংশকে গর্ভযন্ত্র বলে। গর্ভযন্ত্রের তিনটি কোষের মধ্যে ভেতরের দিকের সবচেয়ে বড়ো কোষটিকে ডিম্বাণু এবং বাইরের দিকের ছোটো কোষ দুটিকে সহকারী কোষ (Synergid) বলে।

(খ) **প্রতিপাদ কোষ (Antipodal cell) :** এরা ডিম্বকমূলের দিকে অবস্থিত ভ্রূণথলির তিনটি বিশেষ কোষ।

(গ) **সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (Secondary nucleus) :** দুমেরু থেকে আগত এবং ভ্রূণথলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুটি নিউক্লিয়াসকে **মেরু নিউক্লিয়াস (Polar nucleus)** বলে। নিউক্লিয়াস দুটি মিলিত হয়ে যে একটি ডিপ্লয়েড (2n) নিউক্লিয়াস গঠন করে তার নাম সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস।

বিভিন্ন প্রকার ডিম্বক : ডিম্বকরন্ধ্র, ডিম্বাকনাড়ী, ডিম্বকমূল ইত্যাদি অংশের পারস্পরিক অবস্থান অনুযায়ী ডিম্বক নিম্নলিখিত প্রকার হয়ে থাকে।

১। **উর্ধ্বমুখী (Orthotropous or Atropous) :** উর্ধ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ ওপরে থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকনাড়ী, ডিম্বমূল ও ডিম্বকরন্ধ্র একই সরল রেখায় খাড়াভাবে অবস্থিত থাকে। ডিম্বকরন্ধ্র শীর্ষে এবং ডিম্বকমূল গোড়ায় অবস্থান করে। উদাহরণ : বিষকাটালী (পানি মরিচ), গোলমরিচ, পান ইত্যাদি।

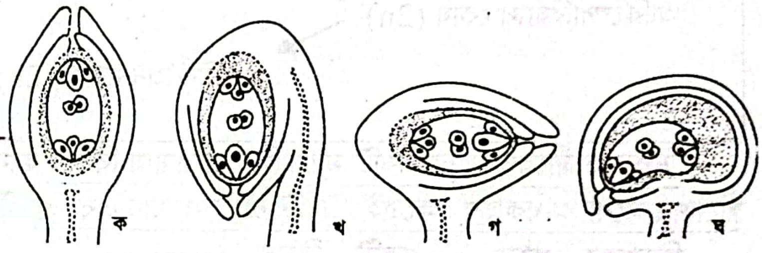

চিত্র ১০.৪ : বিভিন্ন প্রকার ডিম্বকের গঠন। (ক) উর্ধ্বমুখী; (খ) অধোমুখী, (গ) পার্শ্বমুখী; (ঘ) বক্রমুখী।

২। **অধোমুখী বা নিম্নমুখী (Anatropous) :** অধোমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ নিচে থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র নিচের দিকে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি থাকে, আর ডিম্বকমূল ওপরে থাকে। উদাহরণ : শিম, রেড়ি, ছোলা ইত্যাদি। উর্ধ্বমুখী ও অধোমুখী একটি অপরটির উল্টো।

৩। **পার্শ্বমুখী (Amphitropous) :** পার্শ্বমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ ওপরে বা নিচে নয়, এক পাশে থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকরন্ধ্র ও ডিম্বকমূল বিপরীতমুখী অবস্থানে দু পাশে থাকে এবং ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থান করে। উদাহরণ-ক্ষুদিপানা, পপি (আফিম) ইত্যাদি।

MENINGES Academic And Admission Care

৪। **বক্রমুখী (Campylotropous) :** বক্রমুখী অর্থাৎ ডিম্বকের মুখ পার্শ্বমুখীর চেয়ে কিছুটা বেঁকে নিচের দিকে মুখ করানো অবস্থায় থাকে। এ প্রকার ডিম্বকে ডিম্বকমূল ডিম্বকনাড়ীর সাথে সমকোণে অবস্থিত কিন্তু ডিম্বকরন্ধ্র অঞ্চলটি একটু বাঁকা হয়ে ডিম্বকনাড়ীর কাছাকাছি চলে আসে। উদাহরণ- সরিষা, কালকাসুন্দা।

স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ বা পরিস্ফুটন (Development of female gametophyte) ও গঠন : স্ত্রীরেণু (megaspore) **হলো স্ত্রীগ্যামিটোফাইট-এর প্রথম কোষ।** কার্যকরী স্ত্রীরেণুটি বিভাজিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট গঠন করে। স্ত্রীগ্যামিটোফাইট **এমব্রিয়োস্যাক** (embryo sac) বা **ভ্রূণথলি** নামেও পরিচিত। ভ্রূণথলির গঠন প্রধানত তিন প্রকার; যথা— (i) **মনোস্পোরিক** (monosporic)−এক্ষেত্রে একটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে; (ii) **বাইস্পোরিক** (bisporic)−এক্ষেত্রে দুটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে, এটি *Allium* type **হিসেবে পরিচিত** এবং (iii) **টেট্রাস্পোরিক** (tetrasporic)− এক্ষেত্রে চারটি স্ত্রীরেণুই ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে। টেট্রাস্পোরিক ৭ প্রকার হয়, প্রধান *Peperomia* type **যা ১৬-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট হয়।** *Fritiliaria* type **৮-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।** শতকরা প্রায় ৭৫টি উদ্ভিদেই মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়। তাই এখানে ভ্রূণথলি গঠনের মনোস্পোরিক প্রক্রিয়াই বর্ণনা করা হলো। মনোস্পোরিক অধিকাংশই, ৮-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ভ্রূণথলি গঠন করে। ব্যতিক্রম হলো *Oenothera* type **যা 8-নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।** মনোস্পোরিক *Polygonum* ধরন হিসেবেও পরিচিত। সর্বপ্রথম স্ট্রাসবার্গার ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে *Polygonum divaricatum* নামক উদ্ভিদে মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠনের বর্ণনা দেন।

স্ত্রীগ্যামিটোফাইট সৃষ্টি : এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ হতে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু গঠিত হয় যার মধ্যে ওপরের তিনটি নষ্ট হয়ে যায় এবং নিচেরটি কার্যকরী থাকে। কার্যকরী স্ত্রীরেণু নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াস দুটি স্ত্রীরেণু কোষের দু' মেরুতে অবস্থান করে। প্রতিটি মেরুর নিউক্লিয়াস পরপর দু'বার বিভাজিত হয়ে চারটি করে নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রতিটি নিউক্লিয়াস অল্প সাইটোপ্লাজম এবং হালকা প্রাচীর দিয়ে আবৃত থাকে (কাজেই কোষও বলা যেতে পারে)। ইতোমধ্যে স্ত্রীরেণুকোষটি একটি দু'মেরু যুক্ত থলির ন্যায় অঙ্গে পরিণত হয় এবং এর প্রতি মেরুতে ৪টি করে মোট ৮টি নিউক্লিয়াস থাকে। এ অবস্থায় প্রতি মেরু হতে একটি করে নিউক্লিয়াস থলির মাঝখানে চলে আসে এবং পরস্পর মিলিত হয়, যাকে ফিউশন নিউক্লিয়াস বা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (fusion nucleus or secondary nucleus) বলা হয়।

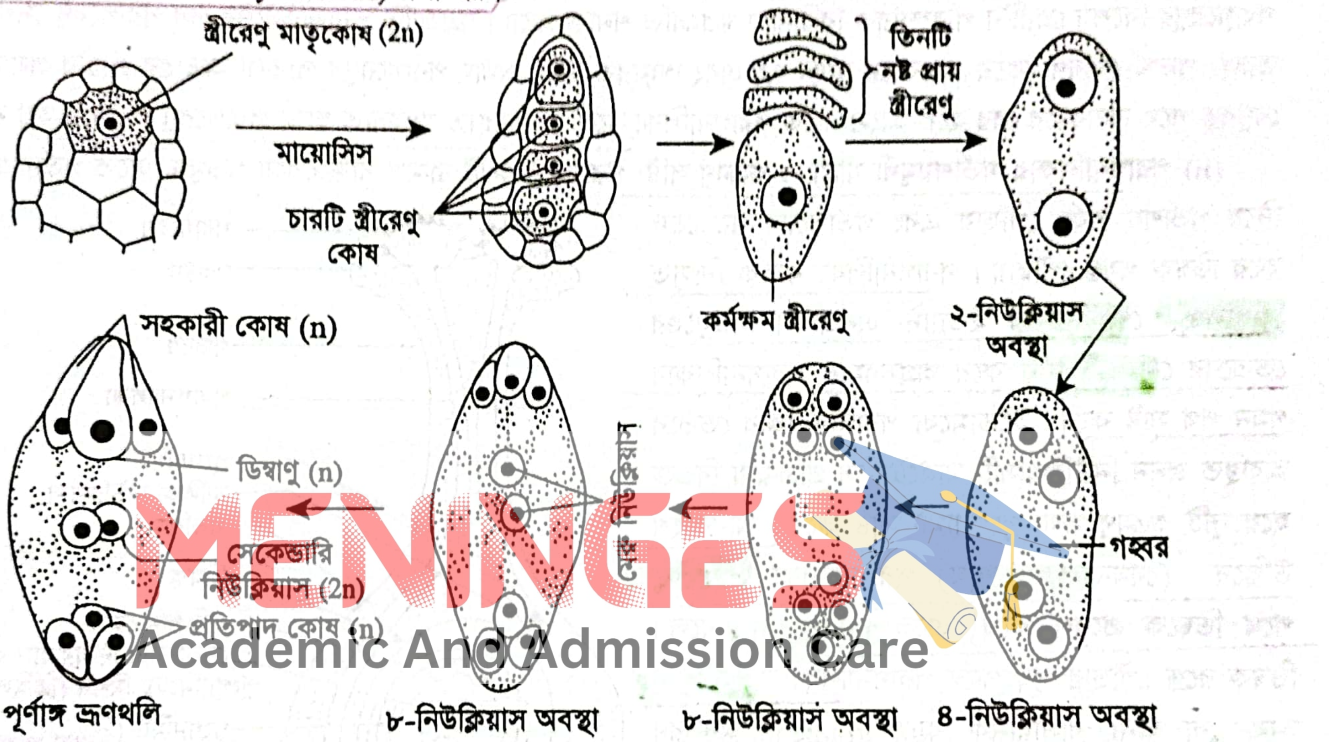

MENINGES Academic And Admission Care

চিত্র ১০.৫ : মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ বা স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের বিকাশ।

ভ্রূণথলির যে মেরু ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে থাকে সে মেরুর তিনটি নিউক্লিয়াসকে একত্রে **এগ অ্যাপারেটাস** (egg apparatus) বা **ডিম্বাণু যন্ত্র** বা **গর্ভযন্ত্র** বলে। ডিম্বাণু যন্ত্রের মাঝখানের নিউক্লিয়াসটি বড়ো থাকে, একে **এগ, ওভাম বা উস্ফিয়ার** (egg, ovum or oosphere) বলা হয়। বাংলায় একে আমরা ডিম্বাণু বা স্ত্রীগ্যামিট বলি। ডিম্বাণুর দু'পাশের দুটি নিউক্লিয়াসকে **সিনারজিড** (synergid) বা সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস বা সাহায্যকারী কোষ বলা হয়। ভ্রূণথলির যে মেরু ডিম্বকমূলের দিকে থাকে সে মেরুর নিউক্লিয়াস তিনটিকে প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস বা প্রতিপাদ কোষ বলে।

ভ্রূণথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস, প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসকে মিলিতভাবে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট বলা হয়। ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি ঘটে। স্ত্রীগ্যামিটোফাইট স্পোরোফাইটের ওপর নির্ভরশীল।

প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীরেণুতে ৮টি নিউক্লিয়াস থাকে, এর মধ্য থেকে দু'টি মাঝখানে এসে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। ভ্রূণথলি বিকাশের শেষ পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের চার দিকে হালকা কোষপ্রাচীর সৃষ্টি হয়, তাই বিকশিত ভ্রূণথলি হলো আট নিউক্লিয়াস ও সাত কোষের (সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস দুটি এক প্রাচীর দ্বারা আবৃত হয়) একটি গঠন।

নিষেকক্রিয়া (Fertilization) : অপেক্ষাকৃত বড়ো ও নিশ্চল স্ত্রীগ্যামিটের (ডিম্বাণুর) সাথে ছোটো ও সচল পুংগ্যামিটের (শুক্রাণুর) যৌন মিলনকে ফার্টিলাইজেশন (fertilization) তথা নিষেকক্রিয়া, নিষেক বা গর্ভাধান বলে। নিষেকের পূর্বে

প্রয়োজন পরাগায়ন। অধিকাংশ উদ্ভিদ পরাগায়নের জন্য বায়ু বা প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। ২,৫০,০০০ পুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগের ওপর উদ্ভিদই পরাগায়নের জন্য পতঙ্গ বা অন্যান্য প্রাণীর ওপর নির্ভরশীল। পরাগধানী থেকে মুক্ত পরাগরেণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে যখন একই প্রজাতির পুষ্পের গর্ভকেশরের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তখন তাকে পরাগায়ন (Pollination) বলে। সকল আবৃতবীজী উদ্ভিদ ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে পরাগায়ন ঘটে থাকে।

নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত উপায়ে উপস্থাপন করা যায়; (i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম, (ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি, (iii) পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিক্ষিপ্তকরণ এবং (iv) ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন।

(i) গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম : প্রথমে পরাগরেণু স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। গর্ভমুণ্ডের বিশেষ প্রোটিন এবং পরাগরেণুর বিশেষ প্রোটিন পারস্পরিক বিক্রিয়ায় স্বপ্রজাতি শনাক্ত করে। স্বপ্রজাতি শনাক্তকরণের পর পরাগরেণু সেখান থেকে তরল পদার্থ শোষণ করে আকারে বড়ো হয় এবং অঙ্কুরিত হয়। অর্থাৎ পরাগরেণুর পাতলা অভ্যন্তর প্রাচীর প্রসারিত হয়ে রেণুরন্ধ্র পথে নলাকারে বের হয়ে আসে যাকে পরাগনালিকা বলে। সাধারণত স্বপ্রজাতি ছাড়া পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয় না।

(ii) পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা ও শুক্রাণু সৃষ্টি: পরাগনালিকাটি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভমুণ্ড হতে গর্ভদণ্ডের ভেতর দিয়ে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌছায় এবং গর্ভাশয়ের স্তর ভেদ করে ডিম্বক পর্যন্ত পৌছায়। পরাগনালিকা কর্তৃক নিঃসৃত সেলুলেজ, পেকটিনেজ ইত্যাদি এনজাইম গর্ভমুণ্ডের ভেতরের কোষ বিগলন করে অগ্রসরমান পরাগনালিকার গমন পথ সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে পরাগনালিকার ভেতরে অবস্থিত জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট সৃষ্টি করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে (যেমন-আম, জাম) পরাগনালিকা ডিম্বকরন্ধ্র পথে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে porogamy বলে। ডিম্বক রন্ধ্রে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত পরাগনালিকা ক্যালসিয়াম আয়ন বা অন্য রাসায়নিক বস্তুর gradient অনুসরণ করে। কিছু কিছু উদ্ভিদে (যেমন-*Casuarina*-ঝাউ) পরাগনালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে **chalazogamy** বলে। কোনো কোনো উদ্ভিদে (যেমন-লাউ, কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বকত্বক ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে **mesogamy** বলে। সাধারণত একটি মাত্র নালিকাই ডিম্বকে প্রবেশ করে। অধিকাংশ উদ্ভিদে পোরোগ্যামি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

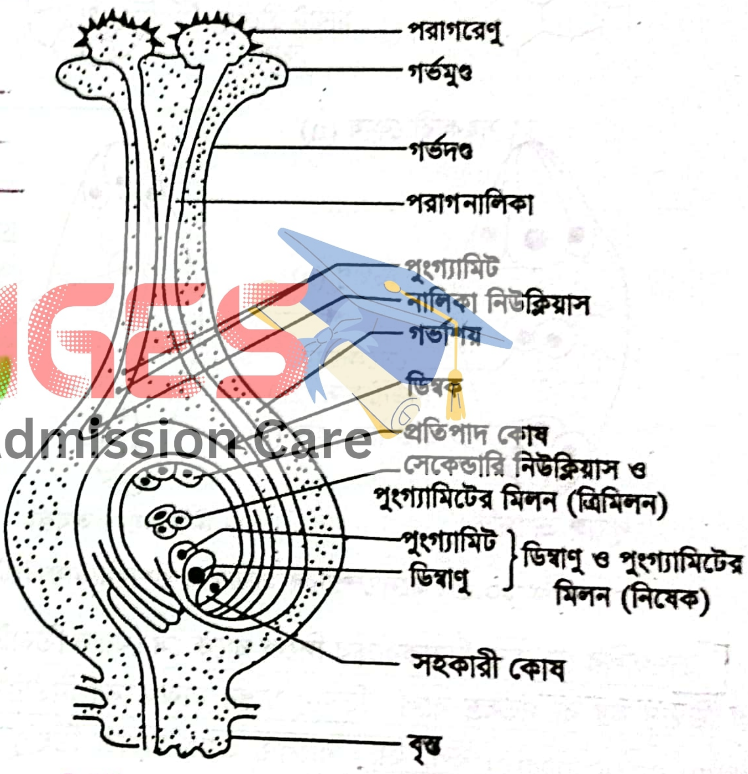

চিত্র ১০.৬ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের নিষেকক্রিয়া।

(iii) পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণু নিক্ষিপ্তকরণ : পরাগনালিকা প্রথমে গর্ভাশয়ের স্তরভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে ডিম্বকে অবস্থিত স্ত্রীরেণু হতে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু ভ্রূণথলিতেই অবস্থান করে। পরাগনালিকাও শেষ পর্যন্ত ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে। মনে করা হয় কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ পরাগনালির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে এটি সাহায্যকারী কোষের ওপর দিয়ে ডিম্বাণুর নিকট পৌছে। পরে পরাগনালিকার অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং শুক্রাণু তথা পুংগ্যামিট ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত হয়। অনেক সময় পরাগনালিকার চাপে একটি সাহায্যকারী কোষ ধ্বংস হয়ে যায়।

MENINGES Academic And Admission Care

(iv) ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণুর সাথে একটি এবং গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে একটি শুক্রাণুর মিলন : পরাগনালিকা হতে ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত দুটি পুংগ্যামিটের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত ও একীভূত হয়ে যায় অর্থাৎ নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। এ প্রকার মিলনকে **সিনগ্যামি (syngamy)** বলে। প্রকৃতপক্ষে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলনই হলো নিষেকক্রিয়া। অপর পুংগ্যামিটটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়। এ প্রকার মিলনকে **ত্রিমিলন** (triple fusion) বলে।

দ্বিনিষেকক্রিয়া বা দ্বিনিষেক (Double fertilization) : একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলন ও সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামিটের মিলন প্রক্রিয়াকে দ্বিনিষেকক্রিয়া (double fertilization) বা দ্বিগর্ভাধান প্রক্রিয়া বলে। দ্বিনিষেক আবৃতবীজী উদ্ভিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (নগ্নবীজী উদ্ভিদের *Ephedra*-তে দ্বিনিষেক আবিষ্কৃত হয় ১৯৯০ সালে –এটি ব্যতিক্রম)।

এ প্রক্রিয়ায় একটি পুংগ্যামিট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং অপর একটি পুংগ্যামিট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়; ফলে ডিম্বাণু জাইগোটে পরিণত হয় এবং ডিপ্লয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস **ট্রিপ্লয়েড** অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে **ত্রিমিলন** (triple fusion) বলা হয়। কারণ এতে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস ও একটি পুংনিউক্লিয়াস–এ তিনটি নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে।

নিষেক ও দ্বি-নিষেক এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিষেক	দ্বি-নিষেক
১. সংজ্ঞা	স্ত্রীগ্যামিট তথা ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের যৌন মিলনের নাম নিষেক।	নিষেকের সময় প্রায় একই সাথে ১টি পুংগ্যামিট ডিম্বাণুর সাথে এবং অন্য ১টি পুংগ্যামিট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হওয়াকে দ্বি-নিষেক বলে।
২. কোন উদ্ভিদে ঘটে	এটি অধিকাংশ উদ্ভিদে হয়ে থাকে।	এটি কেবলমাত্র আবৃতবীজী উদ্ভিদে সংঘটিত হয়। (ব্যক্তবীজী *Ephedra* ব্যতিক্রম)।
৩. গ্যামিটের প্রয়োজনীয়তা	শুধুমাত্র ১টি পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয়।	২টি পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয়।
৪. ফলাফল	শুধুমাত্র ভ্রূণের উৎপত্তি হয়।	ভ্রূণ ও সস্যটিস্যু উৎপন্ন করে।

MENINGES
Academic And Admission Care

নিষেকের পরিণতি (After effects of fertilization) : গর্ভাশয় থেকে ফল সৃষ্টি, ডিম্বক থেকে বীজ সৃষ্টি এবং বীজ হতে নতুন বংশধর সৃষ্টি হলো নিষেকের চূড়ান্ত পরিণতি। নিচে নিষেকের পরিণতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

১। **ভ্রূণের পরিস্ফুটন :** নিষেকের ফলে অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড (n) ডিম্বাণুর সাথে হ্যাপ্লয়েড (n) শুক্রাণুর যৌন মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়েড (n + n = 2n) কোষের সূচনা হয়, তাকে **জাইগোট** বা **উস্পোর** (zygote or oospore) বলে। নিষিক্ত ডিম্বাণু তথা **জাইগোটই** হলো **স্পোরোফাইটের প্রথম** কোষ। জাইগোট তার চারপাশে একটি প্রাচীর নিঃসৃত করে এবং কিছু সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রজাতি বিশেষে জাইগোটের সুপ্তিকাল ভিন্নতর হয়। সুপ্ত অবস্থা কেটে গেলে এতে মাইটোটিক বিভাজন শুরু হয়। প্রথম বিভাজন সাধারণত আড়াআড়ি (transversely) ভাবে হয়, ফলে একটি দ্বিকোষী আদিভ্রূণ (proembryo) গঠিত হয়। আদিভ্রূণটি ক্রম বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণে পরিণত হয়।

২। **সস্যের উৎপত্তি : সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের (2n) সাথে একটি শুক্রাণুর (n) মিলনের ফলে যে ট্রিপ্লয়েড (3n) এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তা বার বার বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে সস্য বা এন্ডোস্পার্ম টিস্যু গঠন করে।** এ সময় প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উপাদান উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ থেকে এসে সস্যটিস্যু সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সস্যটিস্যু প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ, লিপিড ও প্রোটিন জমা করে।

৩। **ফল সৃষ্টি :** ফল হলো রূপান্তরিত গর্ভাশয় যা নিষেকের পর বিকশিত হয়। **নিষেকের ফলে গর্ভাশয় উদ্দীপ্ত হয়ে ফলে পরিণত হয়।** নিষেক শেষে পুষ্পের স্তবকগুলো নিস্তেজ হয়ে এক সময় ঝরে পরে। গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে যায়। গর্ভাশয়

পরিপক্ব হয়ে মাতৃউদ্ভিদ থেকে পৃথকও হয়ে যায়। ফলের আকার, আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে রয়েছে সীমাহীন বৈচিত্র্য। প্রত্যেকটি উদ্ভিদের ফল দেখে তার উৎস-উদ্ভিদকে নিশ্চিত করা যায়। ফল বীজকে পুষ্টি দান করে এবং বিসরণে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ফল সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য বীজের বিস্তার ঘটানো।

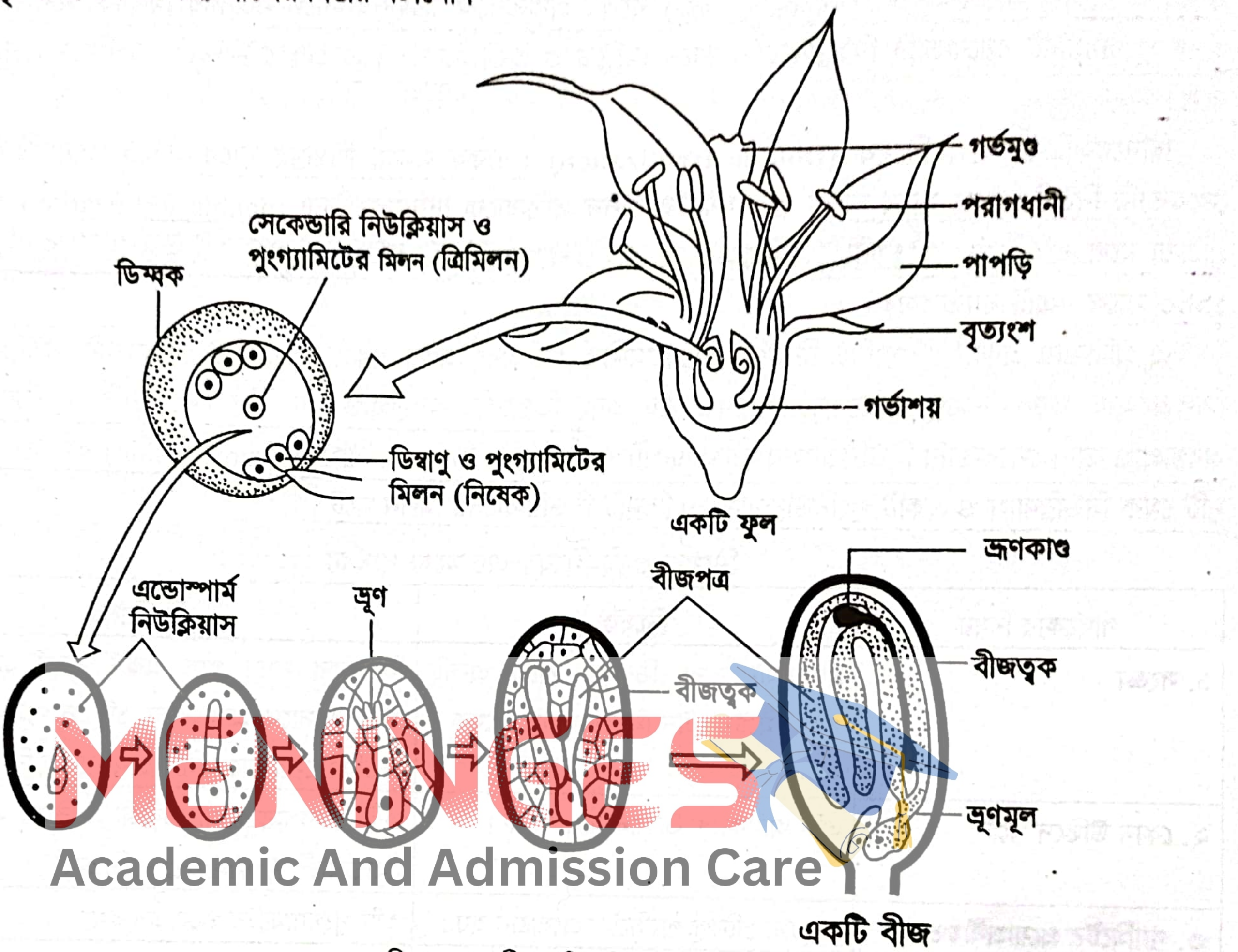

Academic And Admission Care

চিত্র ১০.৭ : বীজ সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

৪। **বীজ সৃষ্টি :** ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ এবং আবৃতবীজী উদ্ভিদে বীজ সৃষ্টি হয়। নিষেকের পর বিভিন্ন ধরনের বিভাজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে **ডিম্বক** (ovule) ক্রমান্বয়ে বীজে পরিণত হয়।

জাইগোটস্থ আদিভ্রূণ ক্রমবিভাজন ও পরিস্ফুটনের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত একটি ভ্রূণ গঠন করে। ভ্রূণে থাকে বীজপত্র (cotyledon), ভ্রূণকাণ্ড (plumule) ও ভ্রূণমূল (radicle)। একই সাথে সস্য বা এন্ডোস্পার্মও (endosperm) গঠিত হয়। ভ্রূণ পরিস্ফুটনের সময় ভ্রূণপোষক টিস্যু (nucellus) ভ্রূণকে পুষ্টি দান করে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি নিঃশেষ হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি **পরিভ্রূণ** (মাত্র একটি আবরণ) হিসেবে অবস্থান করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এন্ডোস্পার্মও নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, এরূপ বীজকে অসস্যল বীজ বলে।

নিষেকের পর ডিম্বকের অভ্যন্তরে এরূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিম্বকের ত্বক দুটি অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। রসালো ডিম্বকটি পানি হারিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজে পরিণত হয়। এরূপ পরিবর্তনকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীজের একটি তৃতীয় স্তর সৃষ্টি হয়, যাকে এরিল (aril) বলে। লিচু, কাঁঠলিচু ও জায়ফলে এরূপ এরিল দেখা যায়। শাপলা বীজেও এরিল আছে। লিচু ও কাঁঠলিচুর এরিল হলো ভোজ্য অংশ।

যাহোক নিষেকের পর ডিম্বকটি বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বড়ো, শক্ত ও শুষ্ক হয়ে একটি বীজে পরিণত হয়। অঙ্কুরোদগমের পর বীজ হতে প্রজাতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ আত্মপ্রকাশ করে।

প্রজননের সফলতা নির্ভর করে : (i) পরাগায়ন, (ii) নিষিক্তকরণ ও (iii) বীজের বিস্তারের ওপর।

নিষেকের পর গর্ভাশয় (ডিম্বাশয়) এবং ডিম্বকের বিভিন্ন পরিবর্তন	
নিষেকের আগে	**নিষেকের পরে বিকশিত হলে**
১। গর্ভাশয়	১। ফল
২। গর্ভাশয় প্রাচীর	২। ফলত্বক
৩। ডিম্বক	৩। বীজ
৪। ডিম্বক বহিঃত্বক বা এক্সাইন	৪। টেস্টা (বীজ বহিঃত্বক)
৫। ডিম্বক অন্তঃত্বক বা ইন্টাইন	৫। টেগমেন (বীজ অন্তঃত্বক)
৬। নিউসেলাস বা ভ্রূণপোষক টিস্যু	৬। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিঞ্চিৎ থাকলে তা পেরিস্পার্ম (পরিভ্রূণ) হয়
৭। ডিম্বাণু বা এগ	৭। ভ্রূণ (embryo)
৮। সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস	৮। এন্ডোস্পা[illegible] সস্য
৯। সহকারী কোষ বা সিনারজিড	৯। নষ্ট হয়ে যায়
১০। অ্যান্টিপোডাল বা প্রতিপাদকোষ	১০। নষ্ট হয়ে যায়
১১। মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র	১১। বীজের মাইক্রোপাইল (বীজরন্ধ্র)
১২। হাইলাম বা ডিম্বকনাভী	১২। হাইলাম (বীজনাভী)
১৩। ফিউনিকুলাস বা ডিম্বকনাড়ী	১৩। বীজের বোঁটা (বীজবৃন্ত)
১৪। ক্যালাজা বা ডিম্বকমূল	১৪। নষ্ট হয়ে যায় (বীজমূল)

MENINGES
Academic And Admission Care

নিষেকক্রিয়ার গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of fertilization)

১. **ক্রোমোসোমের ভারসাম্য রক্ষায় :** নিষেক প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু ও পুংগ্যামিটের মিলনের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় দু' প্রস্থ হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোম মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা ফিরে আসে। ফলে প্রজাতির ক্রোমোসোম সংখ্যার স্থিরতা রক্ষিত হয়।

২. **ফল ও বীজ সৃষ্টি :** নিষেকের উদ্দীপনায় ডিম্বাশয় ও ডিম্বক পর্যায়ক্রমে ফল ও বীজে পরিণত হয়।

৩. **নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি :** নিষেকের ফলে বংশধরদের মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার ঘটে। কখনো নতুন প্রজাতি সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

৪. **বিবর্তনে :** নিষেকের পরে সৃষ্ট প্রকরণ বিবর্তনের ধারা নির্দেশ করে।

৫. **অধিক ফলনশীল ও সহনশীল ফসল সৃষ্টি :** নিষেক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিক ফলনশীল ও সহনশীল ফসল উৎপন্ন হয়।

৬. **উদ্ভিদের বংশরক্ষা :** নিষেকক্রিয়ার মাধ্যমে ফল ও বীজ সৃষ্টি হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশরক্ষা করে। বীজের সৃষ্টি না হলে বেশির ভাগ সপুষ্পক উদ্ভিদই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো।

৭. **খাদ্যের যোগান :** উদ্ভিদের ফল ও বীজের ওপরই প্রাণিকুল বিশেষ করে মানুষ নির্ভরশীল। কাজেই নিষেকক্রিয়া যত না গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদকুলের জন্য তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মানবজাতির জন্য। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে, বেল, ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি যা খেয়ে থাকি তা সবই নিষেকক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়।

৮. **জেনেটিক ডাইভারসিটি সৃষ্টি :** যৌনপ্রজননে নিষেকক্রিয়ায় জিনের মিশ্রণ (রিকম্বিনেশন) ঘটে। এর ফলে জেনেটিক ডাইভারসিটি সৃষ্টি হয়।

যৌন প্রজননের সুফল

১। যৌন প্রজননের ফলে রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে জেনেটিক ডাইভার্সিটি তৈরি হয়।

২। জেনেটিক ডাইভার্সিটির কারণে উদ্ভিদের নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে সুবিধা হয়।

৩। নতুন প্রকরণ সৃষ্টি হতে পারে।

৪। আমাদের খাদ্য দানা, তৈলবীজ ইত্যাদি এর মাধ্যমেই পেয়ে থাকি।

২। অযৌন প্রজনন (Asexual reproduction) : পুং ও স্ত্রীগ্যামিটের মিলন ছাড়া উদ্ভিদের যে প্রজনন ঘটে তাকে অযৌন প্রজনন বলে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। আবৃতবীজী উদ্ভিদে সাধারণত দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

(a) অযৌন স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে : নিম্নশ্রেণির বেশকিছু উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের রেণু বা স্পোর (spore) তৈরি হয়। এসব স্পোর অঙ্কুরিত হলে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। অনুকূল পরিবেশে এসব স্পোরে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে এবং নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

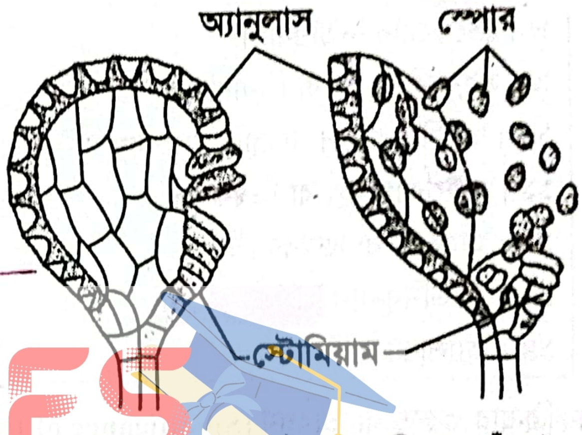

চিত্র ১০.৮ : ফার্নের স্পোরাঞ্জিয়াম (বাঁয়ে) ও এর বিদারণ (ডানে)

পরিবেশের তারতম্যে অধিকাংশ ছত্রাক ও শৈবাল বিভিন্ন প্রকার স্পোর গঠন করে। এদের মধ্যে পেনিসিলিয়ামের কনিডিয়া (conidia) বা কনিডিওস্পোর (conidiospore), মিউকরের স্পোরানজিওস্পোর (sporangiospore) বা গনিডিয়া (gonidia), অ্যাগারিকাসের বেসিডিওস্পোর (basidiospore) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদিকে শৈবালের মধ্যে ক্ল্যামাইডোমোনাস চলরেণু বা জুওস্পোর (zoospore) এবং স্থিররেণু (resting spore) বা অ্যাকাইনেটি (akinete) এবং অন্যান্য বহু শৈবালের স্থূল প্রাচীরাবদ্ধ অ্যাপ্ল্যানোস্পোর (aplanospore) ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ধরনের অযৌন স্পোর। এছাড়া ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটাভুক্ত উদ্ভিদের রেণুথলিতে (sporangium) উৎপন্ন রেণুগুলো অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তারে সহায়ক। ফার্ন (fern) ও লাইকোপোডিয়াম (*Lycopodium*)-এর স্পোর সম-আকৃতির অর্থাৎ হোমোস্পোরাস (homoporous), কিন্তু সেলাজিনেলা (*Selaginella*), শুষনি শাক (*Marsilea*) ইত্যাদির স্পোর অসম-আকৃতির অর্থাৎ হেটারোস্পোরাস (heterosporous)।

(b) দেহ অঙ্গের মাধ্যমে : আবৃতবীজী উদ্ভিদে দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন প্রজনন হয়ে থাকে। এরূপ জননকে অঙ্গজ প্রজনন (vegetative reproduction) বলা হয়। অন্যভাবে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ নতুন জীব সৃষ্টি করলে তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্গজ প্রজনন হয়ে থাকে। আবার কৃত্রিম উপায়েও অঙ্গজ প্রজনন করা হয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের অঙ্গজ প্রজনন সম্বন্ধে বর্ণনা করা হলো :

(ক) উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন : নিম্নলিখিত উপায়ে স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন ঘটতে পারে।

(i) মূল দ্বারা (By roots) : মিষ্টি আলু, ডালিয়া, শতমূলী, কাঁকরোল, পটল প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল থেকেই নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। জমিতে এদের মূল লাগানো হয়।

(ii) কাণ্ড দ্বারা (By stem) : গোলআলু, আদা, পিঁয়াজ, সটি, ওলকচু প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড থেকেই নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। কলা, পুদিনা, আনারস, চন্দ্রমল্লিকা, বাঁশ এগুলোর সাকার-এর (বিশেষ কাণ্ড) সাহায্যে প্রজনন হয়।

MENINGES
Academic And Admission Care

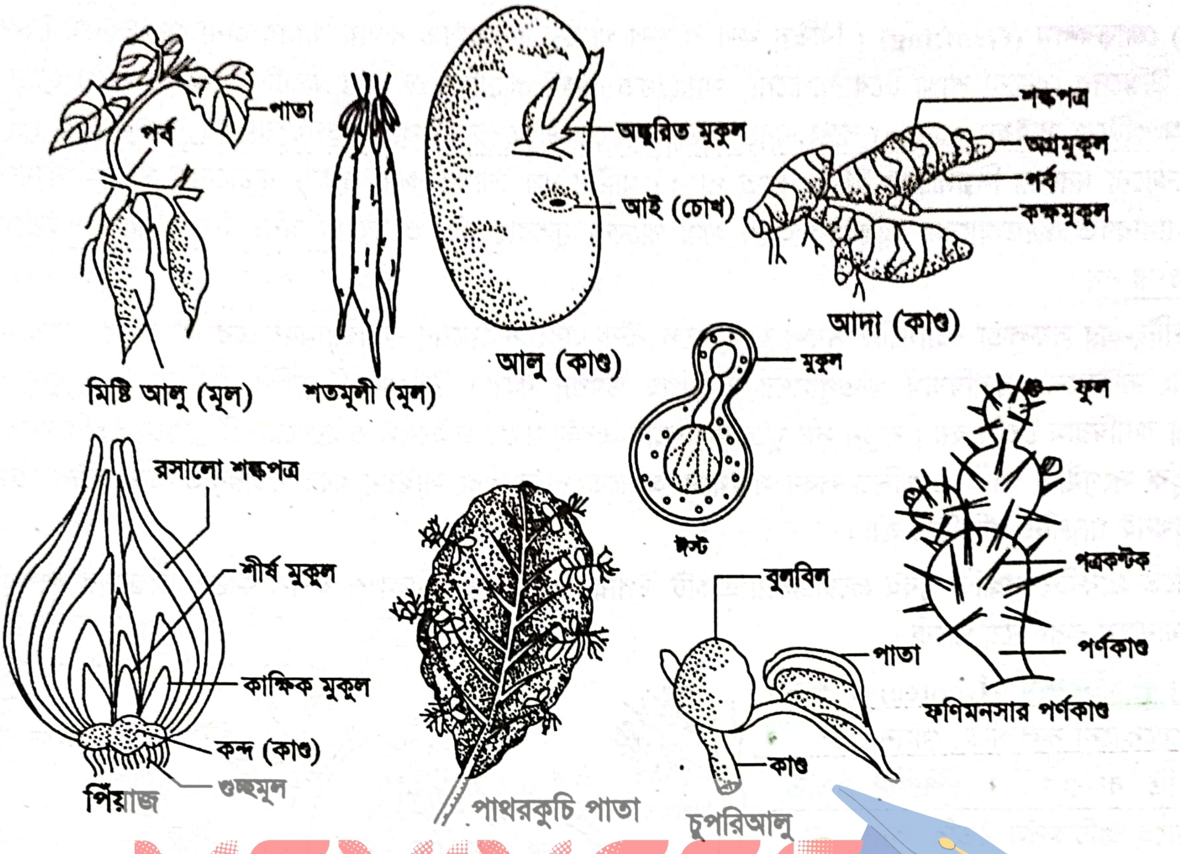

চিত্র ১০.৯ : কয়েকটি উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন অঙ্গ।

MENINGES
Academic And Admission Care

(iii) পাতার মাধ্যমে (By leaf) : পাথরকুচি পাতা মাটিতে ফেলে রাখলেই একটি পাতার কিনারা থেকে বহু নতুন গাছের জন্ম হয়। এগুলোই হলো স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন-এর উদাহরণ।

(iv) বুলবিল বা কক্ষমুকুল : কোনো কোনো উদ্ভিদে পরিবর্তিত কক্ষমুকুল তথা বুলবিল দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে। যেমন— চুপরিআলু।

(v) অর্ধবায়বীয় কাণ্ড দ্বারা : কচুজাতীয় উদ্ভিদে অর্ধবায়বীয় কাণ্ড (রানার যা লতি হিসেবে পরিচিত) দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে। আমরুল শাকের স্টোলন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে।

(vi) মুকুলোদগম (Budding) : ঈস্ট নামক এককোষী ছত্রাকের মাতৃকোষ থেকে এক বা একাধিক মুকুল সৃষ্টি হয়। মুকুলগুলো মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ঈস্টের জন্ম দেয়।

(vii) পর্ণকাণ্ড দ্বারা : ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড থেকে নতুন গাছ হয়।

(খ) উদ্ভিদের কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন : উদ্ভিদের কোনো দৈহিক অঙ্গ যেমন— মূল, কাণ্ড, পাতা ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করার প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন বলে। কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফুল ও ফলের গুণগতমান বজায় রেখে এ ধরনের জনন ঘটানো হয়। যে পদ্ধতিতে এটি সম্ভব তাকে কলম করা বলে। কলম নিম্নলিখিত উপায়ে করা হয়ে থাকে।

(i) কাটিং বা স্লিপ (Cutting or Slip) : জবা, আখ, গোলাপ, পাতাবাহার, সজিনা, আপেল, কমলালেবু ইত্যাদি গাছের পরিণত কাণ্ডের অংশবিশেষ কেটে সিক্ত বা ভিজে মাটিতে পুঁতলে তা থেকে শিকড় গজায় এবং স্বতন্ত্র নতুন উদ্ভিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ii) দাবাকলম (Layering) : লেবু, যুঁই প্রভৃতি গাছের মাটি সংলগ্ন লম্বা শাখাকে বাঁকিয়ে মাটিতে চাপা দিলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মাটির মধ্যে অবস্থিত শাখাটির পর্ব থেকে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। মাটিতে চাপা পড়া অংশের বাকল (ছাল) কেটে দিলে সেখানে দ্রুত মূল গজায়। মূলসহ শাখাটি কেটে অন্য জায়গায় লাগালে নতুন উদ্ভিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(iii) জোড়কলম (Grafting) : বিভিন্ন ফল ও ফুল গাছের উন্নতজাত বজায় রাখার জন্য জোড়কলম তৈরি করা হয়। নির্বাচিত উদ্ভিদের কোনো শাখা টবে লাগানো সাধারণত একই প্রজাতিভুক্ত অন্য একটি উদ্ভিদের সাথে জুড়ে দিতে হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিকে **সাইয়ন** (scion) বলে এবং সাইয়নকে যে উদ্ভিদের সাথে জোড়া দেয়া হয় তাকে **স্টক** (stock) বলে। স্টক যেকোনো ধরনের নিম্নমানের উদ্ভিদ হতে পারে। মাটির রস শোষণ করে ওপরে পাঠানোই স্টকের কাজ। অন্যদিকে সাইয়ন সাধারণত উন্নতজাতের উদ্ভিদের অংশ হয়ে থাকে। সুতরাং ফল ও ফুলের চরিত্র নির্ভর করে সাইয়নের ওপর— স্টকের ওপর নয়।

গ্রাফটিং-এর সফলতা : গ্রাফটিং সফল হতে হলে স্টক এবং সাইয়নের ক্যাম্বিয়ামদ্বয় একত্রে সংযুক্ত হতে হবে। প্রথমে স্টক এবং সাইয়নের ক্যাম্বিয়াম ক্ষতপূরণের টিস্যুপিণ্ড উৎপন্ন করে। উভয়ের টিস্যুপিণ্ড মিলিত ও সংযুক্ত হলে একটি নিরবচ্ছিন্ন ক্যাম্বিয়াম তৈরি হয়। নতুন সৃষ্ট যুক্ত ক্যাম্বিয়াম একই সাথে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুগুচ্ছ তৈরি করে। এর ফলে স্টক কর্তৃক সংগৃহীত পানি ও খনিজ লবণ সাইয়নে আসতে পারে এবং সাইয়ন হতে তৈরিকৃত খাদ্য স্টক টিস্যুতে যেতে পারে। তখনই গ্রাফটিং প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃষিতে গ্রাফটিং পদ্ধতি খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপায়। বর্তমানে অধিকাংশ ফলদ কাষ্ঠল উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি গ্রাফটিং পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

(iv) গুটিকলম (Gootee) : শক্ত কাণ্ডযুক্ত যেকোনো ফল গাছ, যেমন— লেবু, আম প্রভৃতি বা গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের গাছে গুটিকলম তৈরি করা যায়। গুটিকলমের জন্য নির্বাচিত শাখার একটি অংশের বাকল (ছাল) ছাড়িয়ে সেখানে গোবর-মাটি ও খড় দিয়ে ঢেকে শক্ত করে দড়ি বেঁধে দিতে হয়। নিয়মিত সেখানে পানি দিতে থাকলে ঐ অংশে কিছুদিন পর অস্থানিক মূল গজায়। মূলসহ শাখাটি ধীর পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে অন্যত্র রোপণ করলে তা থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়।

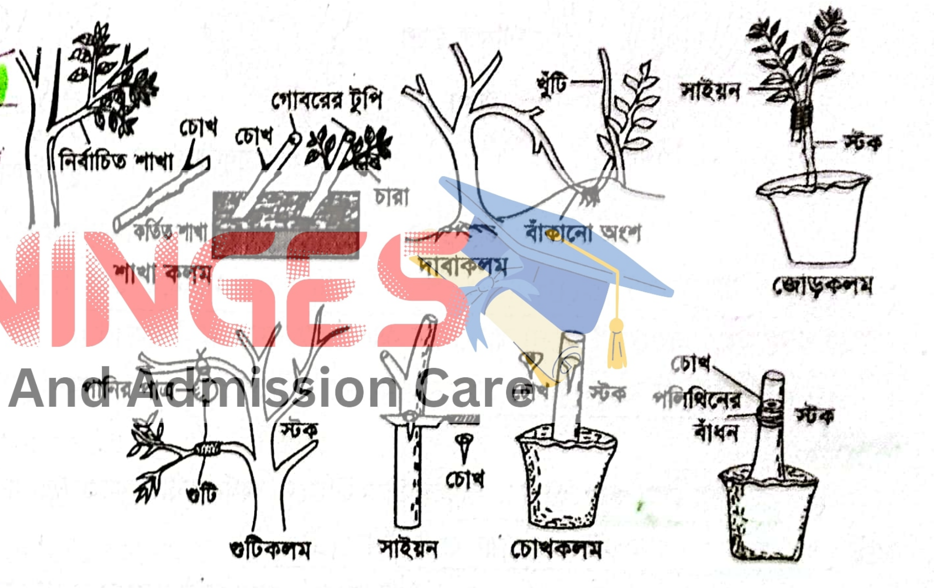

চিত্র ১০.১০ : কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন। (কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি)।

MENINGES Academic And Admission Care

(v) চোখকলম বা কুঁড়ি সংযোজন (Budding) : এ পদ্ধতিতে একটি গাছের কাণ্ডে অন্য গাছের কাক্ষিক মুকুল সংযুক্ত করা হয়। যে গাছের কাণ্ডে মুকুল সংযোজন করা হবে তার সুবিধামতো শাখায় ছুরি (নাইফ) দিয়ে T-আকারে বাকল আলগা করে সেস্থানে কাঙ্ক্ষিত গাছের একটি মুকুল (অনুরূপ আকারে) নিয়ে বায়ুরোধী করে বেঁধে দেয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যে মুকুলটি মাতৃগাছের সাথে সংযুক্ত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে নতুন শাখা উৎপন্ন করে। যেমন— কুল (বরই), গোলাপ গাছে এ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

সার্থক কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজননের জন্য চাই অভিজ্ঞতা, চাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কিছু রাসায়নিক পদার্থ যেমন— অক্সিন (মূল তৈরির জন্য), মোম ইত্যাদি।

(vi) মাইক্রোপ্রোপাগেইশন : অযৌন জননের মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত প্রকরণের বংশবৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। এজন্য বহু সনাতন পদ্ধতি পূর্ব থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এ লক্ষ্যে মাইক্রোপ্রোপাগেইশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র একটু টিস্যু থেকে অসংখ্য চারা সৃষ্টি করা যায় বলেই এ পদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছে মাইক্রোপ্রোপাগেইশন।

সুবিধা

১। প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিসমূহের তুলনায় এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে যেকোনো কাঙ্ক্ষিত নতুন প্রকরণের অসংখ্য চারা উৎপাদন করে অল্প সময়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে নেয়া যায়।

২। ভাইরাসমুক্ত চারা তৈরি করা যায়।

৩। বিরল উদ্ভিদের বহুসংখ্যক চারা উৎপাদন করে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা যায় (এবং বন্য আবাস থেকে আহরণ কমানো যায়)। (টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে এটা করা হয় : বিস্তারিত জীবপ্রযুক্তি অধ্যায়)

উচ্চতর উদ্ভিদেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অযৌন জননই বংশবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Novel Orange এর উল্লেখ করা যায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ব্রাজিলে কমলার বীজ থেকে এমন একটি চারা হয় যার পুষ্পপত্রসমূহ বিকশিত হয় না কিন্তু উন্নতমানের বীজহীন কমলার ফলন হয়। বর্তমানে উৎপাদিত সকল Novel Orange ঐ এক গাছেরই অযৌন জননের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত গাছ থেকে আসছে।

অপুংজনি (Parthenogenesis) : উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে সাধারণত ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন তথা নিষেকের ফলে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি ভ্রূণ সৃষ্টি করে থাকে। যে প্রজনন প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি করে এবং ডিম্বক স্বাভাবিক বীজে পরিণত হয় তাকে **পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংজনি** বলে। হরমোন প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে **পার্থেনোকার্পি** (parthenocarpy) বলে। উদাহরণ- লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি।

পার্থেনোজেনেসিস প্রধানত দু'প্রকার। যথা : (i) হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস এবং (ii) ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস।

(i) হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস (Haploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু সৃষ্টি হলেও তা নিষিক্ত না হয়ে সরাসরি ভ্রূণের সৃষ্টি করে তখন তাকে হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদও হ্যাপ্লয়েড হয় এবং অনুর্বর হয়। *Solanum nigrum, Orchis maculata* উদ্ভিদে অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

MENINGES
Academic And Admission Care

(ii) ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস (Diploid Parthenogenesis) : যখন স্বাভাবিক মায়োসিস প্রক্রিয়ার বদলে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু (2n) সৃষ্টি হয় এবং পরে ভ্রূণে পরিণত হয় তাকে ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস বলে। *Parthenium argentatum* ও *Taraxacum albidum* উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস হতে দেখা যায়।

Nicotiana tabacum (তামাক) এ অনিষিক্ত শুক্রাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। নিষেকক্রিয়া ছাড়া শুক্রাণু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **অ্যান্ড্রোজেনেসিস** (androgenesis) বলে।

কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস : বাহ্যিক আবেশের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বহু উদ্ভিদে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব। পুংগ্যামিট ডিম্বাণুতে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এরূপ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পদার্থ প্রয়োগ করে নিষেক ছাড়াই ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ উৎপন্ন করা হয়। এক্স-রে প্রয়োগে, ইমাস্কুলেশনের পর পরাগায়ন বিলম্বিত করে বা বেলভিটান জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে কৃত্রিম উপায়ে পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো সম্ভব।

পার্থেনোজেনেসিস-এর গুরুত্ব : উদ্ভিদের প্রজননে পার্থেনোজেনেসিস তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব উদ্ভিদে পার্থেনোজেনেসিস হতে দেখা যায় (যেমন– *Solanum nigrum, Parthenium argentatum*) তাদের স্বাভাবিক প্রজনন যৌন প্রকার।

- কোনো উদ্ভিদে যদি অযৌন বা যৌন পদ্ধতিতে প্রজনন না ঘটে কেবল পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় নতুন উদ্ভিদের জন্ম হলে ঐ উদ্ভিদের জন্য এ প্রক্রিয়াটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে বা বিলুপ্তির হাত থেকে প্রজাতিটি রক্ষা পায়।
- এ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকরণ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না।
- এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সুবিধাজনক মিউটেন্ট বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
- এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ ব্রিডিং গবেষণার কাজে লাগানো যায়।

অ্যাপোস্পোরি (Apospory) : ডিম্বকের (ovule) যেকোনো দেহকোষ থেকে (যেমন— ডিম্বক ত্বক, নিউসেলাস) ডিপ্লয়েড ভ্রূণথলি (embryo sac) সৃষ্টি হতে পারে। ডিম্বকের দেহকোষ থেকে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড ভ্রূণথলির ডিপ্লয়েড ডিম্বাণুটি হতে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাপোস্পোরি। অ্যাপোস্পোরি প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদ ডিপ্লয়েড হয় এবং মাতৃউদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন হয়। *Hieracium* উদ্ভিদে এরূপ হতে দেখা যায়।

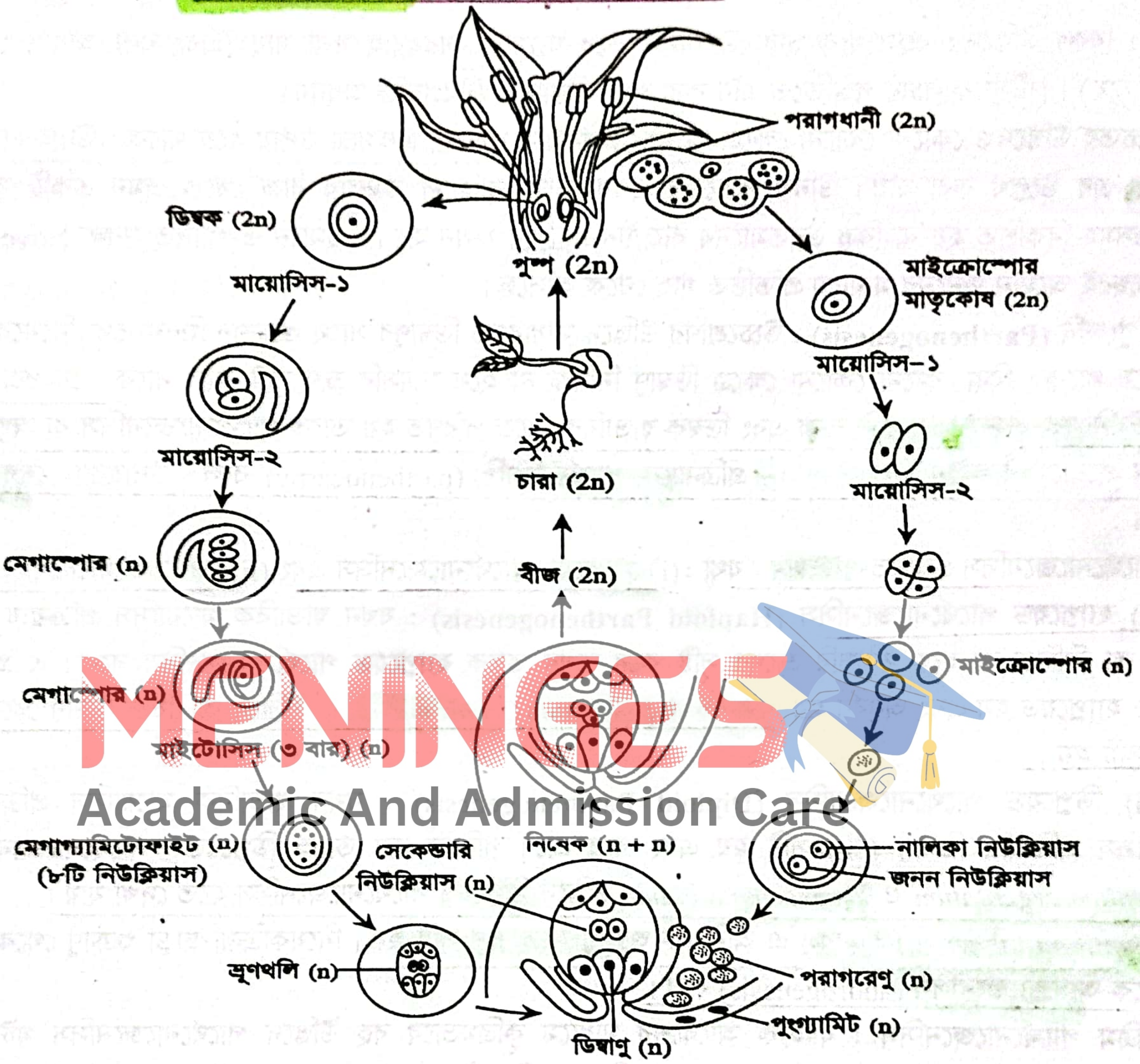

MENINGES Academic And Admission Care

চিত্র ১০.১১ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে জনুঃক্রম।

অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি (Adventitive embryony) : ডিম্বকের ডিম্বক ত্বক বা নিউসেলাসের যেকোনো কোষ হতে ভ্রূণথলি গঠন ছাড়াই (অ্যাপোস্পোরিতে ভ্রূণথলি গঠিত হয়) ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি (adventitive embryony)।

অ্যাপোগ্যামি (Apogamy) : ডিম্বাণু ছাড়া ভ্রূণথলির অন্য যেকোনো কোষ (যেমন- সহকারী কোষ, প্রতিপাদকোষ ইত্যাদি) থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অ্যাপোগ্যামি বলে। এক্ষেত্রে নিষেক ছাড়াই ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। *Allium*-এ এরূপ লক্ষ্য করা যায়।

পার্থেনোজেনেসিস, অ্যাপোস্পোরি, অ্যাপোগ্যামি এবং অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি এর প্রতিটি প্রক্রিয়াতেই নিষেক ছাড়া ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। ডিম্বাণু, ভ্রূণথলি বা ডিম্বকের অন্যান্য কোষ থেকে নিষেক ছাড়া ভ্রূণ তৈরির এসব প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় অ্যাগামোস্পার্মি (agamospermy)। অ্যাগামোস্পার্মি অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য পরাগায়ন আবশ্যকীয় হলে তাকে বলা হয় সিউডোগ্যামি (Pseudogamy)। শাঁস তৈরির জন্যই পরাগায়নের প্রয়োজন হয়— ভ্রূণ তৈরির জন্য নয়।

পার্থেনোজেনেসিস ও যৌন প্রজনন এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পার্থেনোজেনেসিস	যৌন প্রজনন
১। গ্যামিট	পুংগ্যামিটের প্রয়োজন হয় না।	পুং ও স্ত্রী উভয় গ্যামিটের প্রয়োজন হয়।
২। নিষেক	নিষেকের প্রয়োজন হয় না।	নিষেকের প্রয়োজন হয়।
৩। অপত্য সৃষ্টি	অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সরাসরি পূর্ণাঙ্গ অপত্য জীব সৃষ্টি হয়।	নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট থেকে পরিণত অপত্য জীব সৃষ্টি হয়।
৪। চারিত্রিক গুণাবলি	অপত্যের মধ্যে কেবল মাতার চারিত্রিক গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।	অপত্যের মধ্যে মাতা-পিতার চারিত্রিক গুণাবলি পরিলক্ষিত হয়।

অযৌন প্রজনন ও যৌন প্রজননের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অযৌন প্রজনন	যৌন প্রজনন
১। গ্যামিট	গ্যামিট সৃষ্টি হয় না এবং গ্যামিটের প্রয়োজন হয় না।	গ্যামিট সৃষ্টি হয় এবং দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামিটের মিলন ঘটে।
২। কোষবিভাজন	মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয় না।	মায়োসিস কোষ বিভাজনের প্রয়োজন হয়।
৩। বৈচিত্র্য	সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না।	সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদে বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।
৪। অভিযোজন	সৃষ্ট উদ্ভিদ কম অভিযোজনক্ষম হয়।	সৃষ্ট উদ্ভিদ অধিক অভিযোজনক্ষম হয়।
৫। কোথায় ঘটে	সাধারণত নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।	নিম্ন ও উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে ঘটে।
৬। নিষেক	নিষেক ঘটে না।	নিষেক ঘটে।

MENINGES
Academic And Admission Care

বাংলাদেশের জাতীয় ফুল সাদা শাপলার মুখ্য প্রজনন প্রক্রিয়া অযৌন। শাপলার ভূনিম্নস্থ প্রধান মৌল কাণ্ড থেকে চারপাশে ছোটো ছোটো **টিউবার (শালুক)** সৃষ্টি হয়। প্রতিটি টিউবার অর্থাৎ শালুক বিচ্ছিন্ন হয়ে পরবর্তীতে অঙ্কুরায়নের মাধ্যমে এক **একটি স্বতন্ত্র** শাপলা উদ্ভিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লাল শাপলাতে ফল সৃষ্টি হয় না, এদের প্রজনন সম্পূর্ণ অযৌন।

জাতীয় ফল কাঁঠালের প্রজনন প্রক্রিয়া যৌন প্রক্রিয়া যা বীজ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম মৃৎগত।

জাতীয় বৃক্ষ আম-এর স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়া যৌন প্রক্রিয়া, যা বীজ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে পরপরাগায়নের কারণে ফলের স্বকীয় স্বাদ বজায় থাকে না। তাই উদ্যানতত্ত্ববিদ্যায় কাঙ্ক্ষিত বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধি ঘটানো হয় কৃত্রিম অঙ্গজ (অযৌন) প্রজনন প্রক্রিয়ায় যা কলম সৃষ্টি বা গ্রাফটিং-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম মৃৎগত।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ **জলজ উদ্ভিদ পদ্ম** অযৌন প্রজনন তথা অসীম বৃদ্ধিসম্পন্ন রানার (রাইজোম কাণ্ড) কাণ্ডের মাধ্যমে অতি দ্রুত বিরাট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েও স্বতন্ত্র গাছ হতে পারে।

উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Reproduction of Plants)

বর্তমানে প্রচলিত ফসল হতে আরো উন্নত বৈশিষ্ট্যের নতুন প্রকরণ উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে ব্রিডিং (breeding) বলা হয়। নির্বাচন (selection), সংকরায়ন (hybridization), মিউটেশন (mutation) ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে ফসলের উন্নত নতুন জাত উদ্ভাবন করা যায়। দুটি বিসদৃশ নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পরাগায়ন ও প্রজনন ঘটানো সম্ভব সেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করে উন্নত জাত বা প্রকরণ সৃষ্টি করাকে **উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে **সংকর** (hybrid) উদ্ভিদ বলা হয়। উন্নত নতুন ফসল সৃষ্টি প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে **হাইব্রিডাইজেশন** (hybridization) তথা **সংকরায়ন** অন্যতম। প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবেও কিছু কিছু হাইব্রিডাইজেশন ঘটে থাকে, তবে সাধারণত কৃত্রিম উপায়েই হাইব্রিডাইজেশন ঘটানো হয়। **সংকরায়ন** হলো উদ্ভিদ সুপ্রজননের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দুই বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন ভ্যারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়।

ভিন্নতর জেনেটিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দু' বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে **ক্রস (cross) করানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় কৃত্রিম** হাইব্রিডাইজেশন (artificial hybridization) বা সংকরায়ন। সাধারণত উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটি করা হয়।

কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন (সংকরায়ন) প্রক্রিয়া বা কৌশল : কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

১। **প্যারেন্ট নির্বাচন :** কাদের মধ্যে হাইব্রিডাইজেশন করতে হবে তা নির্বাচন করাই হলো প্যারেন্ট নির্বাচন।

২। **প্যারেন্টের কৃত্রিম স্বপরাগায়ন :** প্যারেন্ট স্বপরাগী না হলে এদেরকে কৃত্রিম স্বপরাগায়নের মাধ্যমে হোমোজাইগাস (homozygous) করা হয়।

৩। **প্যারেন্ট উদ্ভিদের ইমাস্কুলেশন :** যে পুষ্পকে মাতৃপুষ্প হিসেবে ধরা হবে তা যদি উভলিঙ্গ (এবং স্বপরাগী হয় অথবা প্রয়োজনে স্বপরাগী হতে পারে) হয় তাহলে ইমাস্কুলেশন করা হয়। **পরিপক্ব হবার আগেই পুষ্প থেকে পুংকেশর মেরে ফেলা বা সরিয়ে ফেলাকে বলা হয় ইমাস্কুলেশন।** এতে করে স্বপরাগায়ন ঘটতে পারে না।

৪। **ব্যাগিং :** পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে ক্রসে ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদের পুষ্পিত অংশকে ঢেকে দেওয়া হয়।

৫। **ক্রসিং :** ব্যাগিং করা পুং উদ্ভিদ হতে পুংরেণু সংগ্রহ করে ব্যাগিং করা স্ত্রী উদ্ভিদের ইমাস্কুলেটেড পুষ্পের গর্ভমুণ্ডে ফেলা হয়।

৬। **লেবেলিং :** ইমাস্কুলেশনের তারিখ, ক্রসিং-এর তারিখ, মাতৃ ও পিতৃউদ্ভিদ পরিচিতি সম্বলিত একটি লেবেল স্ত্রী উদ্ভিদে লাগিয়ে দেয়া হয়।

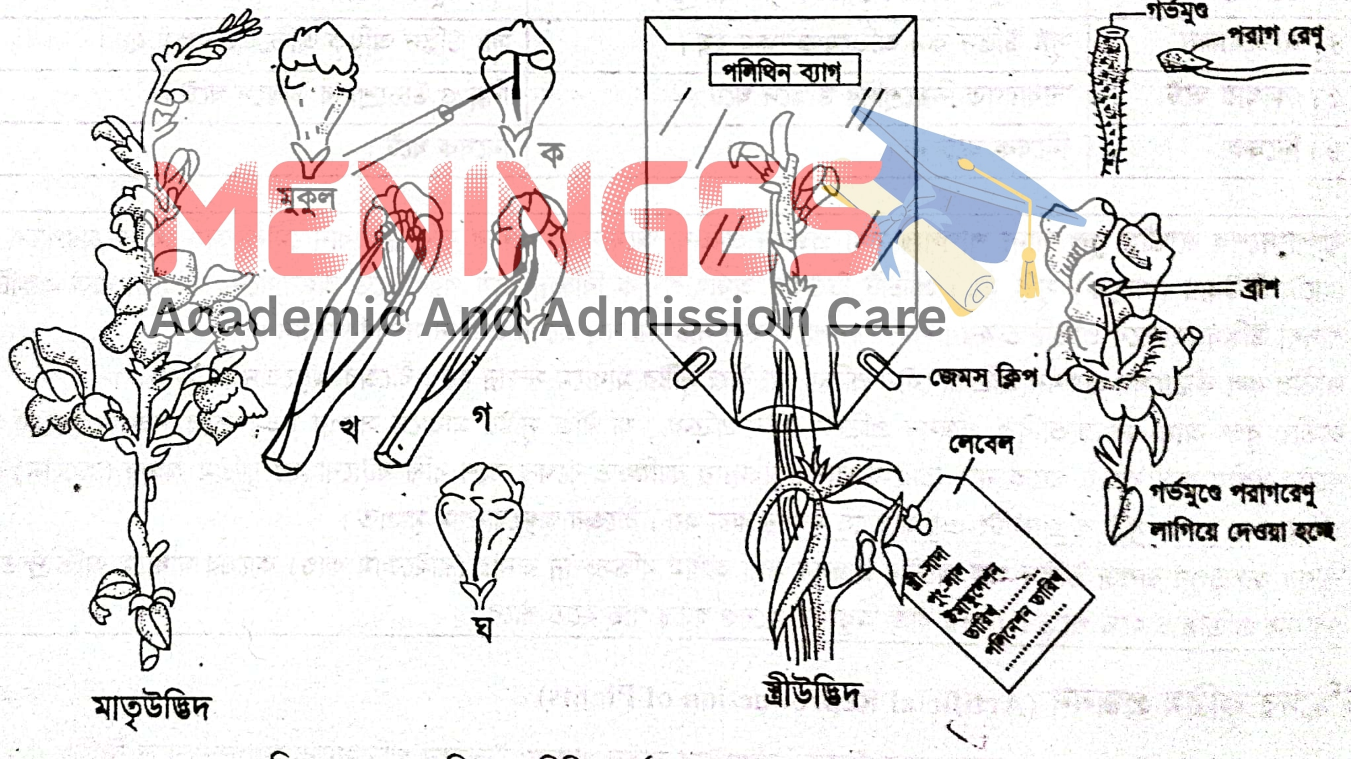

MENINGES
Academic And Admission Care

চিত্র ১০.১২ : ক্রসিং-এর বিভিন্ন পর্যায় (ক-ঘ ইমাস্কুলেশন) বা সংকরায়ন।

৭। **বীজ সংগ্রহ :** কৃত্রিম পরাগায়নের ফলে সৃষ্ট ফলটি পাকলে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

৮। **বীজ বপন ও F_1 উদ্ভিদের উদ্ভব :** পরবর্তী বছর কৃত্রিম ক্রসের ফলে সৃষ্ট বীজগুলো বপন করা হয় এবং F_1-বংশধর সৃষ্টি হয়। F_1-বংশধরগুলো হলো নির্বাচিত প্যারেন্টের হাইব্রিড। পরে F_2 .....F_6 পর্যন্ত বংশধর সৃষ্টি করে উন্নত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়।

৯। **F_1 বংশধরের ব্যবহার ও নতুন প্রকরণ সৃষ্টি :** F_1 বংশধরের দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে যেসব উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো F_2 বংশধর। একই পদ্ধতিতে কয়েক প্রজন্ম (generation) ধরে এভাবে সংকরায়ন করতে করতে একটি নতুন প্রকরণের জন্ম হয়।

প্রকৃতপক্ষে ৩ হতে ৬ নম্বর ধারাকে মিলিতভাবে কৃত্রিম প্রজননের কলাকৌশল বলা হয়।

সংকরায়ন পদ্ধতির সতর্কতা (Precaution)

১। প্যারেন্ট নির্বাচন করার সময় তাদের পার্থক্যগুলো সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে হয়।
২। ইমাস্কুলেশন ও পরাগায়নের সময় হাত, সূঁচ, চিমটা, তুলি প্রভৃতি স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হয়।
৩। লক্ষ্য রাখতে হবে, ইমাস্কুলেশনের সময় যেন একটি পুংকেশরও থেকে না যায় এবং গর্ভকেশরের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।
৪। ব্যাগিং ঠিকমতো করতে হবে এবং এর মধ্যে বায়ু প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকতে হবে।
৫। সংকর বীজ সংগ্রহ এবং এক্ষেত্রে কলা-কৌশল গ্রহণ সঠিকভাবে নিতে হবে।

বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা

উদ্ভিদ বিবর্তনে কৃত্রিম প্রজননের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

ভ্যারিয়েশন সৃষ্টি : বিবর্তনের আধুনিক ধারণা মতে মিউটেশন, ক্রোমোসোমীয় মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন, প্রজাতি বৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত গুণসম্পন্ন নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হয় যার মাধ্যমে ভ্যারিয়েশন (বৈচিত্র্যের) সৃষ্টি হয়।

প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত তৈরি : কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রতিরোধক্ষম জাত তৈরি করা যায়। এ জাত নতুন পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি : শস্যের সর্বোচ্চ ফলনের প্রধান সমস্যা হলো রোগ ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমের বিভিন্ন ফসলের রোগ প্রতিরোধী জাত তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। BRRI উদ্ভাবিত মুক্তা (বিআর-১০), গাজী (বিআর-১৪), মোহিনী (বিআর-১৫)। এগুলো রোগ প্রতিরোধী জাত।

গুণগত মান উন্নয়ন : খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে দানার আকার, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, দীর্ঘ সংরক্ষণ সময় ইত্যাদি উন্নত বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এসব বৈশিষ্ট্য স্থানান্তর করে উদ্ভিদের গুণগত মান উন্নয়ন করা যায়।

আবাদকাল সংক্ষিপ্তকরণ : বন্যার কারণে অনেক নিম্নভূমির আবাদ নষ্ট হয়ে যায়। আবার ঝড়ের প্রকোপেও অনেক ফসল নষ্ট হয়। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে ফসলের আবাদকাল ২০–৩০ দিন পর্যন্ত কমানো সম্ভব। এতে বন্যার পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা যাবে।

MENINGES
Academic And Admission Care

কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে ফসলের অসংখ্য উন্নত ফলনশীল জাত। উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর অধিকাংশই আবার রোগ ও ক্ষরা প্রতিরোধক্ষম। প্রতি বছর পৃথিবীতে উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর কারণে লক্ষ লক্ষ টন ফলন বেড়ে চলেছে। সংক্ষিপ্ত আকারে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব নিম্নরূপ :

(১) উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন, (২) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৩) প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজনক্ষম জাত উদ্ভাবন, (৪) উচ্চফলনশীল হাইব্রিড উদ্ভাবন, (৫) দৃষ্টিনন্দন অর্কিড উদ্ভাবন, (৬) দৃষ্টিনন্দন গোলাপ উদ্ভাবন, (৭) নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন, (৮) বীজহীন ফলের জাত উদ্ভাবন, (৯) অধিক ফলনশীল শাক-সবজির জাত উদ্ভাবন এবং (১০) প্রাণীর কৃত্রিম প্রজননে বহু উন্নত জাত উদ্ভাবন। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

❑ **উচ্চফলনশীল ধানের জাত সৃষ্টি :** ১৯৬০ এর দশকে ফিলিপিনসে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের (IRRI-International Rice Research Institute) বিজ্ঞানিগণ **ইরি** ধান উদ্ভাবন করেন। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধান ইরি-২০, ইরি-৮, ইরি-৫, ইরি-২৮, ইরি-২৯ ইত্যাদি। একরপ্রতি এদের ফলন বেড়েছে বহুগুণ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্রে (BRRI-Bangladesh Rice Research Institute) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধান চান্দিনা, বিরিশাইল, ইরিশাইল ইত্যাদির ফলনও অনেক বেশি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত চারটি উফশী জাতের নাম হলো- চান্দিনা (বিআর-১), মালা (বিআর-২), শাহী বালাম (বিআর-১৫) এবং শ্রাবনী (বিআর-২৬)। গত ৪০ বছরে এশিয়ায় ধানের উৎপাদন কমপক্ষে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিক ফলনশীল ইরি বা বিরি ধান উদ্ভাবনের আগে পৃথিবীর এ অঞ্চলে, বিশেষ করে আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলে কয়েক বছর পর পরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো, অথচ তখন লোকসংখ্যা ছিল আজকের তুলনায় অনেক কম এবং ধান চাষের জমিও ছিল অনেক বেশি। এর প্রধান কারণ হলো তখন ধানের ফলন একরপ্রতি খুবই কম ছিল, ফলে কোনো বছর আগাম বন্যা বা খরা দেখা দিলেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। তখনকার সময়ে চাষকৃত জাতগুলোর একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন ছিল ৩০–৩৫ মণ। বর্তমানে চাষকৃত উচ্চফলনশীল জাতের একরপ্রতি সর্বাধিক ফলন হয় ৭০–৯০ মণ।

ইরি-৮, ইরি-৫, ইরিশাইল এগুলো উচ্চফলনশীল ধানের জাত। ইন্দোনেশিয়ান পেটাধান ও তাইওয়ানের ডি. জি. উজেন ধানের মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে **ইরি-৮**। এর একরপ্রতি ফলন ৯০–১০০ মণ। ইরি-৫ উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটা ধান ও টোংকাই ধান এর সংকর করে। **ইরি-৫** এর ফলন একরপ্রতি ৭০–৭৫ মণ। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত ইরিশাইল উদ্ভাবন করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ান পেটাধান, ভারতের টি. কে. এম-৬ ধান এবং তাইওয়ানের টাইচু-১ এর মধ্যে সংকর করে। এর একরপ্রতি ফলন ৭০–৭৫ মণ। এমনিভাবে বিআর-২০ এবং বিআর-৩ এর মধ্যে সংকরায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে **বিরিশাইল**। বিআর-২৮ এবং বিআর-২৯ আরও উন্নত জাত।

কৃষকের কাছে বোরো মৌসুমে চাষের জন্য সবচেয়ে প্রিয় ধান ব্রি-২৮ এবং ব্রি-২৯। ব্রি-২৯ এর চাল সরু এবং লম্বা। সম্প্রতিকালে এ জাত দু'টির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে এবং সহজেই ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই গত ১৬/৫/২০২৩ তারিখের কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ জাত দুটিকে ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

ব্রি-২৮ এর বিকল্প হিসেবে ব্রি-৬৮, ৮১, ৮৬, ৮৮, ৯৬, ১০১, ১০৫ এবং বঙ্গবন্ধু-১০০ আবাদ করা যেতে পারে। ব্রি-২৯ এর বিকল্প হিসেবে ব্রি-৮৯, ৯২, ৯৭, ৯১, ১০২, বঙ্গবন্ধু-১০০, বিনা-২৫; লবণাক্ত এলাকায় বিনা-১০ চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে।

❑ **উচ্চফলনশীল গমের জাত তৈরি :** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চাষকৃত গমও কৃত্রিম প্রজননের ফসল। আগে গমের ফলন হতো খুবই কম। তাছাড়া বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায়ই ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। ফসল রক্ষার জন্য তখন লক্ষ লক্ষ ডলারের ওষুধ প্রয়োগ করতে হতো। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বর্তমান গমের ফলনও বেশি। আবার রোগ প্রতিরোধক্ষম হওয়ায় ওষুধ প্রয়োগের তেমন প্রয়োজন হয় না। এর ফলে খরচ কম হয়, অথচ ফসল বেশি পাওয়া যায়।

MENINGES
Academic And Admission Care

অনেক আগে যে গমের চাষ হতো তার ফলন ছিল খুবই কম; তাছাড়া এর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও ছিল কম। বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে উন্নতজাতের গম, যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চাষ করা হয়। মেক্সিকোর (CIMMIT) সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) ১৭ জাতের উফশী গম উদ্ভাবন করেছে। এসব জাতের মধ্যে বলাকা, কাঞ্চন, আনন্দ, আকবর, বরকত ও সওগাত বেশ জনপ্রিয় জাত। উচ্চফলনশীল গম উদ্ভাবনের জন্য আমেরিকান বিজ্ঞানী Norman Earnest Borlaug ১৯৭০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

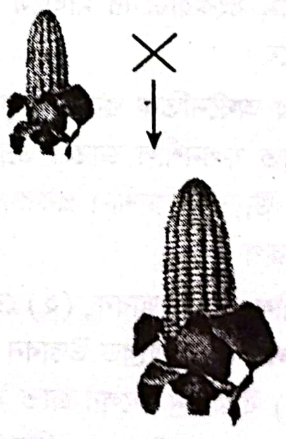

চিত্র ১০.১৩ : হাইব্রিড ভুট্টার সৃষ্টি।

❑ **উন্নত জাতের ভুট্টা উৎপাদন :** আমেরিকার বিজ্ঞানী G. H. Shull ১৯০৮ সালে ভুট্টার সংকর উদ্ভিদ সৃষ্টির মাধ্যমে ভুট্টার দানা উৎপাদনে দারুণভাবে সফল হন। এরপর ভুট্টার দ্বি-সংকর পদ্ধতিতে এর উৎপাদন আরও বাড়ানো হয়েছে।

❑ **উন্নত জাতের ফুল ও অর্কিড উৎপাদন :** বর্তমান সময়ে চাষকৃত অধিকাংশ ফুলই সংকরায়নের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতি বছর বহু অর্কিড সৃষ্টি করা হচ্ছে সংকরায়নের মাধ্যমে। কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে যে জাত তৈরি হচ্ছে তার ফলে ফুল চাষে বিপ্লব ঘটছে। যেমন— গোলাপের হাইব্রিড-টি, ফ্লোরিবান্ডা, মেরিগোল্ড, গ্ল্যাডিওলাস, রজনীগন্ধা ইত্যাদি প্রায় সব জাতই হাইব্রিড।

❑ **হাইব্রিড ফল ও সবজি উৎপাদন :** কৃত্রিম হাইব্রিডাইজেশনের মাধ্যমে আম, তরমুজ, আপেল, বরই ইত্যাদি ফল এবং মিষ্টি কুমড়া, লাউ, টমেটো, ঝিঙা, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি উৎপাদন করে বাজারজাত করা হচ্ছে। বীজহীন ফল ও সবজি কৃত্রিম প্রজননের সুফল।

ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে। শতকরা প্রায় **৭৫টি** উদ্ভিদেই মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়। **ভ্রূণথলি গঠন আবৃতবীজীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।** যদিও আবৃতবীজী উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার ভ্রূণথলি দেখা যায় তবুও ৮০% প্রজাতিতে একই ধরনের, যা **"পলিগোনাম টাইপ"** নামে পরিচিত। নিচে এর বিকাশ বর্ণনা করা হলো—

মেগাস্পোর মাতৃকোষ (স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ) থেকে সৃষ্ট চারটি মেগাস্পোরের (স্ত্রীরেণু কোষ) মধ্যে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) বাইরের তিনটি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং শুধু ভেতরেরটি কার্যকরি থাকে, যা ক্রমশ একটি ভ্রূণথলি গঠন করে। এমন একক নিউক্লিয়াস থেকে সৃষ্ট ভ্রূণথলিকে **মনোস্পোরিক** (monosporic) বলে। সক্রিয় মেগাস্পোর কোষটি প্রথমে আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াস গঠন করে। এরা কোষের দু'প্রান্তে চলে যায় এবং পরপর দু'বার মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটি করে নিউক্লিয়াস গঠন করে। প্রতি প্রান্ত থেকে একটি করে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রে সরে আসে এবং তারা মিলিত হয়ে **গৌণ নিউক্লিয়াস** (2n) গঠন করে। ডিম্বকরন্ধ্রের প্রান্তে অবশিষ্ট তিনটি নিউক্লিয়াস কোষ গঠন করে ও **গর্ভযন্ত্রে** পরিণত হয়। এদের একটি অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে **ডিম্বাণু** (egg) গঠন করে আর বাকি দু'টিকে **সহকারি** কোষ (synergids) বলে। নিচের তিনটি নিউক্লিয়াস সামান্য সাইটোপ্লাজমসহ কোষে পরিণত হয় এবং তাদের একত্রে **প্রতিপাদ** কোষ (antipodal cells) বলে। আবৃতবীজী উদ্ভিদে গর্ভযন্ত্র, গৌণ নিউক্লিয়াস এবং প্রতিপাদ কোষগুলো মিলিতভাবে থলিসদৃশ যে দেহ গঠন করে তাকে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট বলে। ডিম্বকের মধ্যে স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি ঘটে। স্ত্রী গ্যামিটোফাইট স্পোরোফাইট এর উপর নির্ভরশীল।

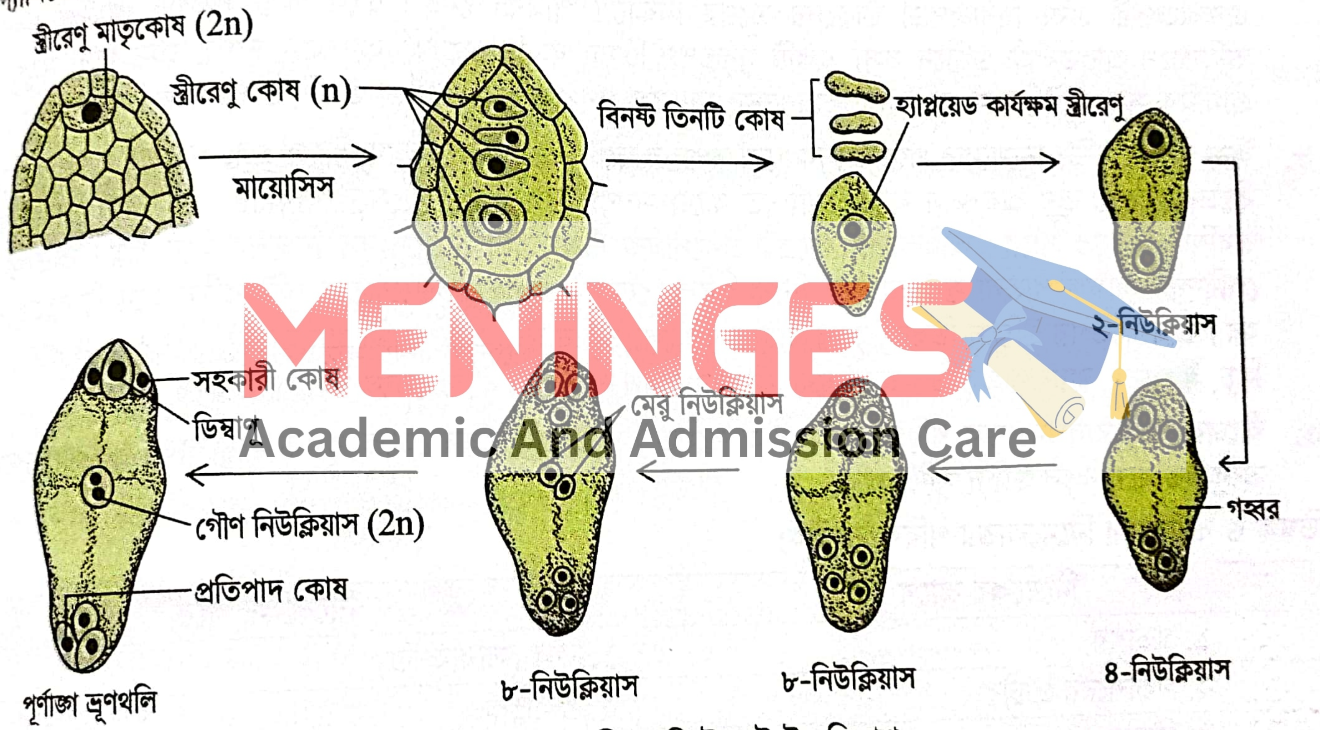

MENINGES
Academic And Admission Care

চিত্র-১০.৫: স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের বিকাশ

৬. **নিষেক (Fertilization):** আবৃতবীজীর যৌন জনন পদ্ধতি **উগ্যামাস** (oogamous) টাইপের। গর্ভযন্ত্রে অবস্থিত নিশ্চল ডিম্বাণুর সাথে সচল শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বলে। এ সময় গর্ভাশয় ও ডিম্বক নিঃসৃত পদার্থে Ca^{++} আয়ন উপস্থিত থাকে। আবৃতবীজীর নিষেক প্রক্রিয়াটি কয়েকটা ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা-

i. **ভ্রূণথলিতে পরাগনালির অনুপ্রবেশ:** গর্ভদণ্ডের মধ্য দিয়ে পরাগনালি গর্ভাশয়ের প্রাচীর ভেদ করে ডিম্বকরন্ধ্রের কাছে পৌঁছায়। আম, জামসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাগনালি ডিম্বকরন্ধ্র দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে (porogamy)। ঝাউসহ কিছু কিছু উদ্ভিদে পরাগনালি ডিম্বকমূল দিয়ে (chalazogamy); লাউ, কুমড়ায় ডিম্বকত্বক ভেদ করে (mesogamy) পরাগনালি ডিম্বকে প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত পরাগনালি ভ্রূণথলিতে অনুপ্রবেশ করে এবং সহকারী কোষের উপর দিয়ে ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছায়। এক সময় পরাগনালির অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে ফেটে যায় এবং শুক্রাণু দুটি ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত হয়।

ii. **ডিম্বাণু অভিমুখে শুক্রাণুর চলন:** শুক্রাণু দু'টির একটি ডিম্বাণু অভিমুখে এবং অপরটি গৌণ নিউক্লিয়াস অভিমুখে অ্যামিবার মতো সরে যেতে থাকে।

iii. **ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন:** দু'টি শুক্রাণুর একটি সহজেই ডিম্বাণুতে পৌছায় এবং ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনকে প্রকৃত নিষেক বা সিনগ্যামি (syngamy) বলে। নিষেকের ফলে ডিপ্লয়েড জাইগোট (2n) উৎপন্ন হয়।

iv. **ত্রিমিলন:** দ্বিতীয় শুক্রাণুটি গৌণ নিউক্লিয়াসের সংস্পর্শে আসে এবং তার সাথে মিলিত হয়ে প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস (3n) গঠন করে এবং এ থেকে উৎপন্ন সস্য কোষ ট্রিপ্লয়েড (3n) প্রকৃতির হয়। শুক্রাণুর (n) সাথে গৌণ নিউক্লিয়াসের (2n) মিলনকে প্রকৃত অর্থে **ত্রিমিলন** (triple fusion) বলে। কারণ, এখানে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস এবং শুক্রাণুর মিলন ঘটে। **ডিম্বাণু ও গৌণ নিউক্লিয়াসের সাথে শুক্রাণু দু'টির মিলনকে একত্রে দ্বিনিষেক (double fertilization) বলে।** প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস হতে বিভাজন ও কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে সস্য টিস্যু (endosperm) উৎপন্ন হয়। **দ্বিনিষেক আবৃতবীজী বা গুপ্তবীজী উদ্ভিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য।**

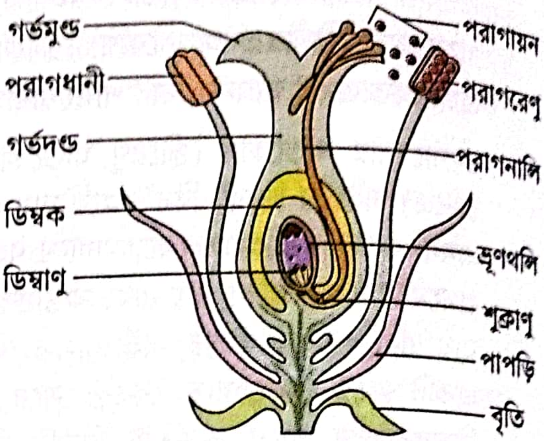

চিত্র-১০.৬: নিষেক প্রক্রিয়া

৭. **ভ্রূণের বিকাশ:** নিষেকোত্তর ডিম্বকের মধ্যে ভ্রূণ এবং সস্য একই সাথে বিকাশ লাভ করে। জাইগোট প্রাচীরে আবদ্ধ হয়ে উস্পোর গঠন করে এবং নির্দিষ্ট সময় সুপ্তাবস্থায় থেকে বিভাজিত হওয়া শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ভ্রূণের বিকাশে পার্থক্য নেই। তবে পরে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদে সস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টিস্যু, কারণ এতে বিকাশমান ভ্রূণের জন্য খাদ্য মজুদ থাকে। প্রাথমিক সস্য নিউক্লিয়াস বার বার বিভাজনের মাধ্যমে ভ্রূণথলিতে ভ্রূণ ছাড়া অবশিষ্ট স্থান পূর্ণ করে থাকে।

৮. **বীজ ও ফল সৃষ্টি:** নিষেকের পরে অনেকগুলো রূপান্তর ঘটে। যার ফলে ডিম্বক বীজে এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। বীজের ভেতরে ভ্রূণ অবস্থান করে। পরিণত বীজে সম্পূর্ণ সস্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হতে পারে আবার আংশিক অবশিষ্ট থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রূণপোষক টিস্যু তথা নিউসেলাস নিঃশেষ হয়ে যায়। কতিপয় ক্ষেত্রে **পেরিস্পার্ম** নামক পাতলা স্তর আকারে টিকে থাকে, যেমন- শাপলা। ডিম্বকত্বক দুটি কঠিন হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। তবে কতিপয় উদ্ভিদে ডিম্বকত্বকের বাইরে রসালো তৃতীয় ডিম্বকত্বক সৃষ্টি হয় যাকে **এরিল** (aril) বলে। যেমন- লিচু, আঁশফল, জায়ফল প্রভৃতি। অন্য দিকে গর্ভাশয় ক্রমশ আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে ফল গঠন করে।

MENINGES
Academic And Admission Care

৯. **বীজের অঙ্কুরোদগম:** ফল পরিপক্ক হলে বীজ সমেত ফলটি মাতৃউদ্ভিদ থেকে পৃথক হয়ে যায়। সুপ্তকাল শেষে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে।

ডিম্বক ও গর্ভাশয়ের নিষেকোত্তর পরিবর্তনসমূহ:

নিষেকের আগে	নিষেকের পরে
১. গর্ভাশয়	১. ফল (সাধারণত)
২. গর্ভাশয়ের প্রাচীর	২. ফলত্বক
৩. ডিম্বক	৩. বীজ
৪. ডিম্বকনাড়ী	৪. বীজবৃন্ত
৫. ডিম্বকনাভী	৫. বীজনাভী
৬. ডিম্বকমূল	৬. নষ্ট হয়ে যায় (বীজমূল)
৭. ডিম্বকরন্ধ্র	৭. বীজরন্ধ্র
৮. ডিম্বক বহিঃত্বক	৮. বীজ বহিঃত্বক (টেস্টা)
৯. ডিম্বক অন্তঃত্বক	৯. বীজ অন্তঃত্বক (টেগমেন)
১০. নিউসেলাস	১০. সাধারণত নিঃশেষ হয়ে যায় অথবা পেরিস্পার্ম
১১. ডিম্বাণু	১১. ভ্রূণ
১২. সহকারি কোষ	১২. নষ্ট হয়ে যায়
১৩. প্রতিপাদ কোষ	১৩. নষ্ট হয়ে যায়
১৪. সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস	১৪. সস্য

পাঠ ২

অযৌন জনন
Asexual Reproduction

১০.২ অযৌন জনন (Asexual Reproduction)

দুটি গ্যামিটের মিলন ছাড়া জীবের বংশবিস্তারের সকল পদ্ধতিকে অযৌন জনন বলে। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। আবৃতবীজী উদ্ভিদে সাধারণত দেহ অঙ্গের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। অযৌন জনন প্রধানত দু'প্রকার– (ক) স্পোরের সাহায্যে অযৌন জনন ও (খ) অঙ্গজ প্রজনন।

১০.২.১ স্পোরের সাহায্যে অযৌন প্রজনন (Asexual Reproduction by Spores)

অপুষ্পক উদ্ভিদ সাধারণত বিশেষ ধরনের রেণু বা স্পোরের উৎপাদনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বিশেষ আকৃতির থলিতে রেণু উৎপন্ন হয়। এ থলিকে রেণুস্থলি বা স্পোরাঞ্জিয়াম (sporangium) বলে। রেণু সাধারণত এককোষী তবে বহুকোষী হতে পারে। সচল অথবা নিশ্চল প্রকৃতির হয়। অনুকূল পরিবেশে রেণু সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন বংশধর উৎপন্ন করে। শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইট ও টেরিডোফাইটে রেণু সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক হারে অযৌন জনন ঘটে।

ছত্রাক ও শৈবালে বিভিন্ন ধরনের স্পোর তৈরি হতে দেখা যায়। যেমন— ছত্রাকের ক্ষেত্রে মিউকরে স্পোরাঞ্জিওস্পোর, পেনিসিলিয়ামে কনিডিওস্পোর, অ্যাগারিকাসে বেসিডিওস্পোর। অন্যদিকে শৈবালে জুস্পোর, অ্যাকাইনেট, অ্যাপ্লানোস্পোর ইত্যাদি স্পোর তৈরি হয়ে থাকে। ফার্ন ও লাইকোপোডিয়ামের স্পোর সম-আকৃতির অর্থাৎ হোমোস্পোরাস (homosporous)। অন্যদিকে, সেলাজিনেলা, শুষনি শাক ইত্যাদির স্পোর অসম-আকৃতির অর্থাৎ হেটারোস্পোরাস প্রকৃতির (heterosporous)।

MENINGES
Academic And Admission Care

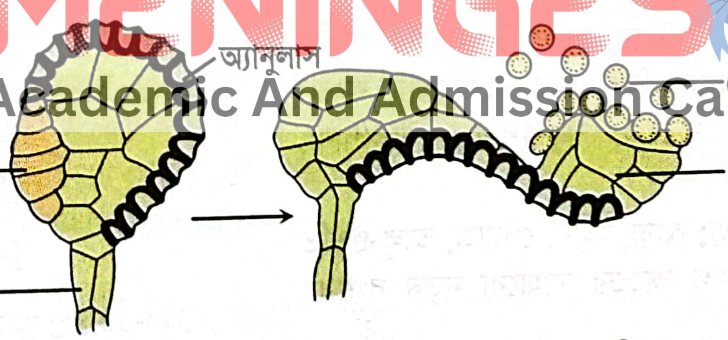

চিত্র-১০.৮: রেণুর সাহায্যে প্রজনন (ফার্নের স্পোরাঞ্জিয়া)

১০.২.২ অঙ্গজ প্রজনন (Vegetative Reproduction)

দেহের অঙ্গজ কোন অংশ যখন সরাসরি বংশধর উৎপন্ন করে তখন তাকে অঙ্গজ প্রজনন বলে। অঙ্গজ প্রজননের ফলে উৎপন্ন বংশধরে মাতৃ উদ্ভিদের গুণাবলি অপরিবর্তিত থাকে। এরূপ বংশধরকে ক্লোন (Clone) বলা হয়। অঙ্গজ প্রজনন স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয় প্রকার হতে দেখা যায়।

স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন (Natural Vegetative Reproduction): প্রকৃতিগতভাবে উদ্ভিদে যে অঙ্গজ প্রজনন ঘটে তাকে স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন বলে। স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন বিভিন্ন প্রকার। যথা—

১. **খণ্ডায়ন (Fragmentation):** যান্ত্রিক আঘাতে বা পুরাতন অংশের পচনের ফলে দেহ খণ্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড হতে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে খণ্ডায়ন বলে। শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা প্রভৃতিতে এরূপ বংশবিস্তার লক্ষ করা যায়।

২. **বাডিং (Budding):** ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট প্রভৃতি এককোষী উদ্ভিদে বাডিং ঘটতে দেখা যায়। এ সময় কোষের এক পাশে স্ফীতি দেখা যায় যাকে মুকুল বা বাড (bud) বলে। মুকুল ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মাতৃদেহ হতে পৃথক হয়ে নতুন বংশধরে পরিণত হয়।

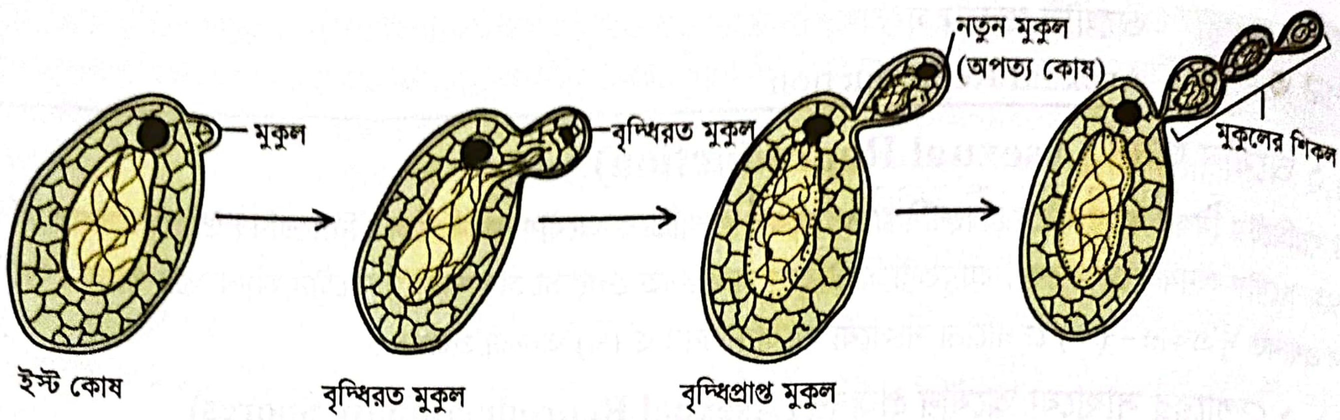

চিত্র-১০.৯: ইস্ট এর বাডিং প্রক্রিয়া

৩. **দ্বি-বিভাজন (Binary Fission):** ব্যাকটেরিয়া ও এককোষী কিছু শৈবাল ও ছত্রাক দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে। এ সময়ে এদের কোষমধ্য অঞ্চলে কোষঝিল্লি ও কোষপ্রাচীরে সংকোচন শুরু হয় এবং সংকোচন ক্রমশ গভীরতর হওয়ায় মাতৃকোষ দুটি অপত্য কোষে বিভক্ত হয়। কোষ দুটি পরস্পর পৃথক হয়ে নতুন বংশধর উৎপন্ন করে।

৪. **কাণ্ডের মাধ্যমে:** কাণ্ড অনেক সময় স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজননে অংশগ্রহণ করে। নিচে কাণ্ডের মাধ্যমে অঙ্গজ প্রজননের কতিপয় পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

স্বাভাবিক কাণ্ড: পান, আখ প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্বে সৃষ্ট বাড থেকে নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয় বলে এদের কাণ্ড খণ্ডিত করে রোপন করা হয়।

অর্ধবায়বীয় কাণ্ড: রানার, স্টোলন, অফসেট, সাকার জাতীয় অর্ধবায়বীয় কাণ্ডের সাহায্যে কিছু গাছ বংশবিস্তার করে। যেমন- কচু, থানকুনি, স্ট্রবেরি, কচুরিপানা, টোপাপানা, চন্দ্রমল্লিকা।

ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের সাহায্যে: আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, আলু প্রভৃতি উদ্ভিদ রূপান্তরিত ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের সাহায্যে নতুন বংশধর উৎপন্ন করে।

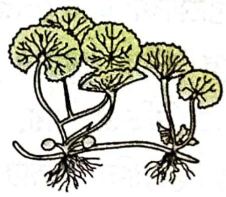

চিত্র-১০.১০: অর্ধবায়বীয় কাণ্ড (থানকুনি)

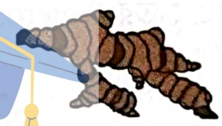

চিত্র-১০.১১: ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের সাহায্যে (আদা)

MENINGES
Academic And Admission Care

৫. **সঞ্চয়ী মুকুলের সহায্যে:** কিছু উদ্ভিদের পাতার কক্ষে উৎপন্ন মুকুল খাদ্য সঞ্চয় করে রূপান্তরিত হয় যাকে বুলবিল বলে। এ বুলবিল বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন বংশধর উৎপন্ন হয়। যেমন— গাছ আলু।

চিত্র-১০.১২: বুলবিলের সহায্যে (গাছ আলু)

৬. **মূলের সাহায্যে:** পটল, কাকরোল, ডালিয়া, মিষ্টি আলু, শতমূলী প্রভৃতি উদ্ভিদের ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত মূলের সাহায্যে বংশবিস্তার ঘটে।

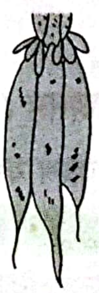

চিত্র-১০.১৩: মূলের সাহায্যে (শতমূলী)

৭. **পাতার সাহায্যে:** পাথরকুঁচি পাতার পত্রফলকের কিনারায় অস্থানিক মুকুল উৎপন্ন হয়। এ পাতা মাটিতে পতিত হলে চারা গাছ জন্মে। এছাড়া নাইট কুইনেও পাতার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

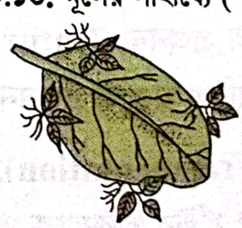

চিত্র-১০.১৪: পাতার সাহায্যে (পাথরকুঁচি)

একক কাজ

উদাহরণসহ উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ জননের প্রকারভেদ ছকাকারে লিপিবদ্ধ করো।

১০.৫ কৃত্রিম প্রজননের ধারণা (Concept of Artificial Reproduction)

আবাদি ফসলের উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। মানুষ তার চাহিদা পূরণের জন্য চারপাশের পরিবেশ থেকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ভালো, সবল, সতেজ উদ্ভিদ নির্বাচনের মাধ্যমে ফসলি উদ্ভিদের উন্নয়ন কাজ শুরু করে। সে সময় মানুষের জ্ঞান ছিল অপরিণত, চাহিদাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। উন্নত শস্য জাত উৎপাদনের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে (১) নির্বাচন, (২) সংকরায়ন বা কৃত্রিম প্রজনন, (৩) উদ্ভিদ প্রবর্তন ও (৪) মিউটেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন জাতে পরিদৃষ্ট প্রয়োজনীয় উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহের সন্নিবেশ ঘটিয়ে একটি নতুন ও উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা ক্রমেই বাস্তবতা লাভ করতে থাকে। **বংশগতীয় পার্থক্য সম্পন্ন দুই বা ততোধিক জাতের উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিমভাবে পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত বৈশিষ্ট্যের একটি নতুন জাত উৎপাদন পদ্ধতিকে কৃত্রিম সংকরায়ন বা কৃত্রিম প্রজনন বলা হয়।** এভাবে উৎপন্ন উদ্ভিদ জাতকে **সংকর** (hybrid) বলে। বর্তমানকালের অধিকাংশ উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত কৃত্রিম প্রজনন বা সংকরায়ন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে কৃত্রিম সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল ধানের মধ্যে বি-আর-৮, বিআর-৯, বিআর-১০ (B-10) উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ সংকরায়নের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রায় তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও আরবদের মধ্যে অধিক ফলন লাভের আশায় খেজুর গাছের কৃত্রিম পরাগায়ন পদ্ধতি চালু ছিল। জার্মান বিজ্ঞানী Kolreuter (১৭৬০) সর্বপ্রথম সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভিদ উন্নয়ন শুরু করেন এবং অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মেন্ডেলের তত্ত্ব পুনঃআবিষ্কারের পর কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন জাতের ফসলের মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়ন করে তাদের উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহ একজাতে সন্নিবেশিত করার প্রচেষ্টা বেগবান হয়।

প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্যে উদ্ভিদে কৃত্রিম সংকরায়ন তথা কৃত্রিম প্রজনন করা হয় —

১. একই জাতে সব ধরনের কাঙ্ক্ষিত ভালো গুণাবলির সন্নিবেশ করা।
২. বিভিন্ন চরিত্রের পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে প্রজননকের বংশগতীয় ভেদ বৃদ্ধি করা।
৩. সংকরীয় সবলতা সৃষ্টি এবং তার ব্যবহার।

MENINGES Academic And Admission Care

১০.৬ কৃত্রিম সংকরায়নের কৌশল (Techniques of Hybridization)

কৃত্রিম সংকরায়নের তথা কৃত্রিম প্রজনন বিভিন্ন ধাপ নিচে আলোচনা করা হলো —

প্রজনক নির্বাচন : প্রজনক হিসেবে ব্যবহারের জন্য এমন উদ্ভিদ নির্বাচন করতে হবে যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভালো বৈশিষ্ট্য প্রচলিত জাতে অনুপস্থিত। নির্বাচিত উদ্ভিদ অবশ্যই নীরোগ এবং সবল হওয়া প্রয়োজন।

প্রজননকের স্ব-পরাগায়ন : বারবার স্ব-পরাগায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রজননকের বিশুদ্ধ সারি তৈরি করা প্রয়োজন হয়। এর ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য দূর হয় এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

ইমাস্কুলেশন : উভলিঙ্গিক ফুলে পরাগ নির্গমনের আগে ফুলের পুংস্তবক অপসারণের প্রক্রিয়াকে ইমাস্কুলেশন বলে। স্ত্রী হিসেবে ব্যবহৃত প্রজনকের স্বপরাগায়ন রোধ করার জন্য ইমাস্কুলেশন করা হয়। সাধারণত ফুল ফোটার আগের দিন জীবাণুমুক্ত চিমটা ও নিডলের সাহায্যে পুংকেশর ছিড়ে ফেলে ইমাস্কুলেশন করা হয়। পরপরাগী ও একলিঙ্গিক ফুলে ইমাস্কুলেশন প্রয়োজন পড়ে না। ফুলের আকার খুব ছোট হলে ৪৫-৫০°সে. তাপমাত্রায় গরম পানিতে ১-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে ফুলের পুংকেশর নষ্ট হয় কিন্তু স্ত্রীকেশর অক্ষত থাকে। ধান, গম প্রভৃতিকে এভাবে গরম পানি বা অ্যালকোহলে ডুবিয়ে একক ফুল বা সম্পূর্ণ পুষ্পমঞ্জরি পুংবিহীন করা যায়।

ব্যাগিং : ইমাস্কুলেশনকৃত ফুলকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরাগসংযোগ থেকে রক্ষার জন্য পাতলা পলিথিন বা কাগজের ব্যাগের সাহায্যে ঢেকে দেওয়াকে ব্যাগিং বলে। ইউক্লিপ বা সুতা দিয়ে ব্যাগটিকে আটকে রাখা হয় এবং শ্বসনের জন্য নিডল দিয়ে পলিথিনে কয়েকটা সূক্ষ্ম ছিদ্র করে দেয়া হয়।

৫. ভ্রূণপোষক টিস্যু (Nucellus tissue): ডিম্বকত্বক দ্বারা আবৃত প্যারেনকাইমা কোষ গঠিত যে টিস্যু ডিম্বকের মূলদেহ গঠন করে তাকে ভ্রূণপোষক টিস্যু বলে।

৬. ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle): ডিম্বকের অগ্রভাগে ভ্রূণপোষক টিস্যুর কিয়দংশ উন্মুক্ত থেকে যে বিশেষ ছিদ্রের সৃষ্টি করে তাকে মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র বলে।

৭. ভ্রূণথলি (Embryosac): ডিম্বকরন্ধ্রের নিকটে ভ্রূণপোষক টিস্যুর মধ্যে বিদ্যমান বৃহদাকার থলির মতো গঠনকে ভ্রূণথলি বা ভ্রূণাধার বলে। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি পরিণত স্ত্রী গ্যামিটোফাইট।

ডিম্বকের প্রকার

আকৃতি অনুযায়ী ডিম্বক প্রধানত পাঁচ প্রকারের, যথা-

১. ঊর্ধ্বমুখী ডিম্বক (Atropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকবৃন্ত, ডিম্বকমূল ও ডিম্বকরন্ধ্র একই সরলরেখায় অবস্থিত থাকায় ডিম্বকটি সোজাভাবে এবং ডিম্বকরন্ধ্রটি উপরের দিকে থাকে। যেমন-পানিমরিচ, বিষ কাটালি, পান, গোলমরিচ ইত্যাদি।

২. অধোমুখী ডিম্বক (Anatropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকমূলটি উপরে এবং ডিম্বক রন্ধ্রটি নিচের দিকে ডিম্বকবৃন্তের পাশে অবস্থিত থাকে। যেমন-মটর, শিম, রেড়ি, ছোলা ইত্যাদি।

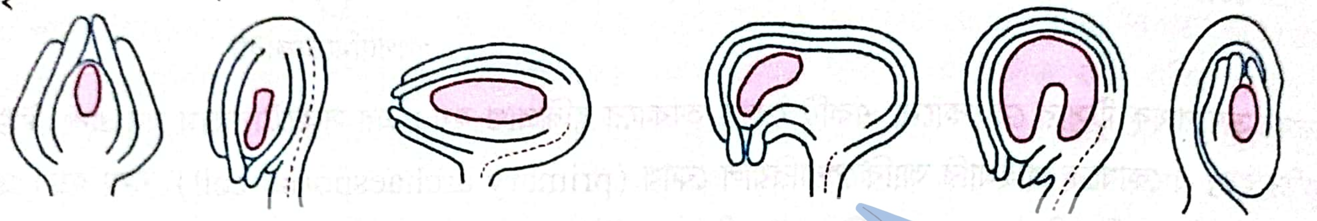

চিত্র ১০.৬ উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের ডিম্বক

MENINGES
Academic And Admission Care

৩. পার্শ্বমুখী ডিম্বক (Amphitropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকটি ডিম্বকবৃন্তের সাথে লম্বভাবে সংযুক্ত থাকে। ডিম্বকবৃন্তের একদিকে ডিম্বকমূল এবং অপরদিকে ডিম্বকরন্ধ্র একই সরল রেখায় অবস্থান করে। যেমন-পপি বা আফিম, পালিক, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি।

৪. বক্রমুখী ডিম্বক (Campylotropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকটি এমনভাবে বক্র হয় যাতে ডিম্বকরন্ধ্রটি ডিম্বক নাভির পার্শ্বে অবস্থান করে। এতে ডিম্বকবৃন্তের এক পার্শ্বে থাকে ডিম্বকমূল এবং অপর পার্শ্বে থাকে ডিম্বকরন্ধ্র। যেমন-সরিষা, কাল্কাসুন্দা ইত্যাদি।

৫. অর্ধ-অধোমুখী ডিম্বক (Hemi-anatropous ovule): এক্ষেত্রে ডিম্বকটি এমনভাবে বক্র হয় যাতে ভ্রূণস্থলিটি অশ্বক্ষুরাকৃতির হয়। এক্ষেত্রেও ডিম্বকবৃন্তের একপার্শ্বে থাকে ডিম্বকমূল এবং অপর পার্শ্বে থাকে ডিম্বকরন্ধ্র। যেমন- পিঙ্ক, ছোটকুট ইত্যাদি।

৪। স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের পরিস্ফুটন (Development of female gametophyte)

অধিকাংশ (75%) আবৃতবীজী উদ্ভিদ মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় স্ত্রী গ্যামিটোফাইট গঠন করে অর্থাৎ গ্যামিটোফাইট গঠনে একটিমাত্র স্ত্রীরেণু অংশগ্রহণ করে। ডিম্বাণু বা স্ত্রীরেণু হলো স্ত্রী গ্যামিটোফাইটের সূচনাকারী কোষ। স্ত্রীরেণু বিকশিত হয়ে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট গঠন করে। এসময় নিম্নলিখিত ধারাবাহিক পরিবর্তনগুলো ঘটে:

১. প্রথমে স্ত্রীরেণুটি আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং উহার নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠন করে।

২. অপত্য নিউক্লিয়াস দুটি পরস্পর হতে পৃথক হয়ে স্ত্রীরেণু কোষের দুই মেরুতে অবস্থান করে।

৩. প্রতিটি অপত্য নিউক্লিয়াস পুনরায় মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে 4টি নিউক্লিয়াস গঠন করে। ইতোমধ্যে স্ত্রীরেণু কোষটিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থলির আকার ধারণ করে ভ্রূণথলি গঠন করে।

৪. পরবর্তী বিভাজনে 4টি নিউক্লিয়াস থেকে ৪টি নিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবং ভ্রূণথলির দুই মেরুতে 4টি করে বিন্যস্ত
হয়। প্রতি মেরুতে 4টি নিউক্লিয়াস একটি কোয়াড্রেট গঠন করে।

৫. এরপর প্রতিটি নিউক্লিয়াস কোয়াড্রেট হতে একটি করে নিউক্লিয়াস ভ্রূণথলির কেন্দ্রস্থলে চলে আসে এবং পরস্পর
মিলিত হয়ে একটি ডিপ্লয়েড সেকেণ্ডারি নিউক্লিয়াস গঠন করে।

৬. ভ্রূণথলির ডিম্বকরন্ধ্রের দিকের মেরুতে বিদ্যমান 3টি নিউক্লিয়াস একত্রে মিলে গর্ভযন্ত্র বা ডিম্বযন্ত্র (egg apparatus) গঠন করে। গর্ভযন্ত্রের মাঝখানের নিউক্লিয়াসটি আকারে বড় ও স্বতন্ত্র হয়, একে ডিম্বাণু বা ওভাম (ovum) বলে। ডিম্বাণুর দুপার্শ্বে অবস্থিত দুটি নিউক্লিয়াসকে সিনারজিড (synergid) বা সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস বলে।

৭. ভ্রূণথলির ডিম্বকমূলের দিকের মেরুতে বিদ্যমান 3টি নিউক্লিয়াস সেলুলোজ প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে 3টি কোষে পরিণত হয়। এদের অ্যান্টিপোডাল বা প্রতিপাদ কোষসমষ্টি (antipodal cells) বলে।

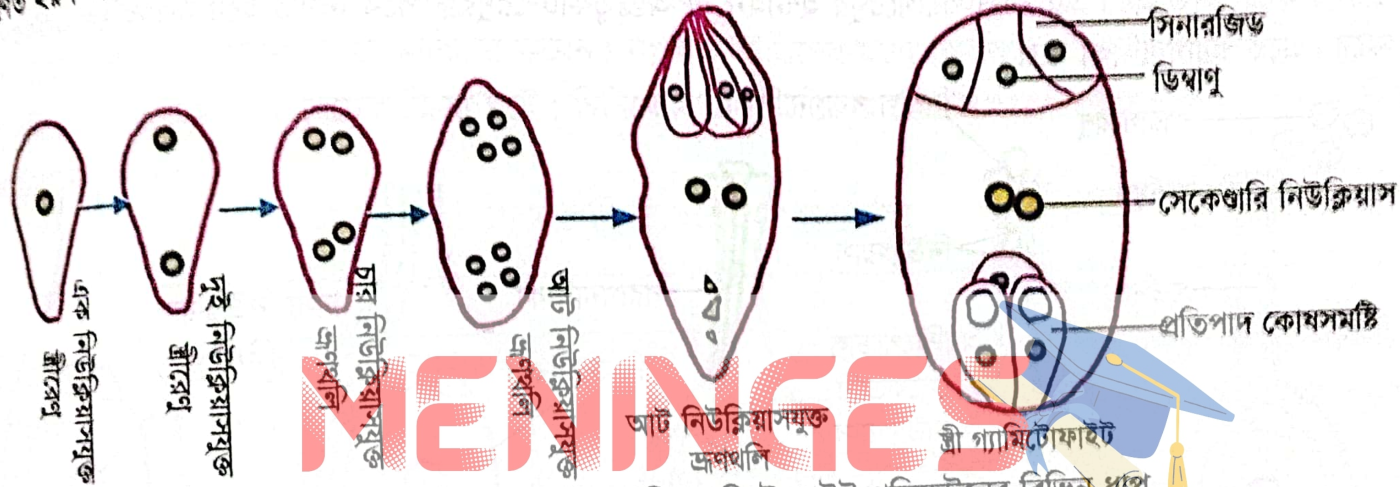

চিত্র ১০.৭ : ... প্রক্রিয়ায় স্ত্রী গ্যামিটোফাইট পরিস্ফুটনের বিভিন্ন ধাপ

MENINGES Academic And Admission Care

এভাবে সৃষ্ট ভ্রূণথলি এবং এতে অবস্থিত ডিম্বাণু, সিনারজিড, সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ও প্রতিপাদ কোষসমষ্টিকে একত্রে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট বলা হয়।

৫। পরাগায়ণ (Pollination)

যে পদ্ধতিতে ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণু স্থানান্তরিত হয়ে ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তাকে পরাগায়ণ বলে। উদ্ভিদ প্রজননের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া হলো পরাগায়ণ। সাধারণত বায়ু, মৌমাছি, প্রজাপতি, মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ, পাখি ইত্যাদি দ্বারা উদ্ভিদের পরাগায়ণ সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদে দুধরনের পরাগায়ণ হয়ে থাকে, যথা- স্বপরাগায়ণ ও পরপরাগায়ণ। যখন একই ফুলে বা একই প্রজাতির অভিন্ন গাছের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগায়ণ সম্পন্ন হয় তখন তাকে স্বপরাগায়ণ (self pollination) বলে। সরিষা, ধুতুরা ইত্যাদি উদ্ভিদে স্ব পরাগায়ণ ঘটে। স্বপরাগায়নে দুটি ফুলের জিনোটাইপ একই রকম হয় তাই উৎপন্ন উদ্ভিদ মাতৃ উদ্ভিদের হুবহু গুণ সম্পন্ন হয় অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে প্রজাতির বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন থাকে বা রক্ষিত হয়। অন্যদিকে যখন একই প্রজাতির ভিন্ন গাছের দুটি ফুলের মধ্যে পরাগায়ণ সম্পন্ন হয় তখন তাকে পরপরাগায়ণ (cross pollination) বলে। শিমুল, পেঁপে ইত্যাদি উদ্ভিদে পরপরাগায়ণ ঘটে। এক্ষেত্রে ফুলের জিনোটাইপ ভিন্ন রকম হওয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদ মাতৃ উদ্ভিদের হুবহু গুণ সম্পন্ন হয় না। ফলে পরবর্তী বংশধরদের মাঝে নতুন প্রকরণ উদ্ভব হতে পারে যা উদ্ভিদ বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৬। নিষেক (Fertilization)

যৌন জননক্ষম জীবের দুটি অসম জননকোষ অর্থাৎ ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনকে নিষেক বা গর্ভাধান বলে। নিষেকের ফলে সৃষ্ট কোষকে জাইগোট (zygote) বলে। নিষেক একটি বিশেষ জৈবিক প্রক্রিয়া। উদ্ভিদের পরাগায়ণের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো নিষেক এবং পরাগায়ণের পরবর্তীতে ফুলে নিষেক সাধিত হয়। এতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ... নিউক্লিয়াস মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং জীবের

ক্রোমোসোম সংখ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। নিষেক ভ্রূণথলিতে বিদ্যমান নিষ্ক্রিয় ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে। নিষেক প্রজাতি নির্দিষ্ট (species specific) অর্থাৎ কেবল একই প্রজাতির ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মধ্যে নিষেক ঘটে। সকল আবৃতবীজী, ব্যক্তবীজী, ব্রায়োফাইটস, টেরিডোফাইটস এবং কিছু শৈবালে নিষেক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

নিষেক কৌশল

নিষেক একটি জটিল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। স্ট্রাসবার্জার (Strassburger, 1884) আবৃতবীজী পুষ্পক উদ্ভিদে নিষেক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। আবৃতবীজী উদ্ভিদে নিম্নলিখিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষেক ক্রিয়া সংঘটিত হয়-

(১) **পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম:** একই প্রজাতির পুরুষ উদ্ভিদের পুংস্তবকের পরাগধানী হতে পরাগরেণু নির্গত হয়ে স্ত্রীস্তবকের উপযুক্ত গর্ভমুণ্ডে স্থাপিত হয় এবং অঙ্কুরিত হয়। অঙ্কুরোদগমের প্রথমে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ড হতে তরল রস শোষণ করে স্ফীত হয়। এর ফলে পরাগরেণুর ইন্টাইন বা অন্তঃত্বকটি রেণুরন্ধ্র পথে নির্গত হয়ে নলাকৃতির নালিকা গঠন করে। একে পরাগনালিকা বলে।

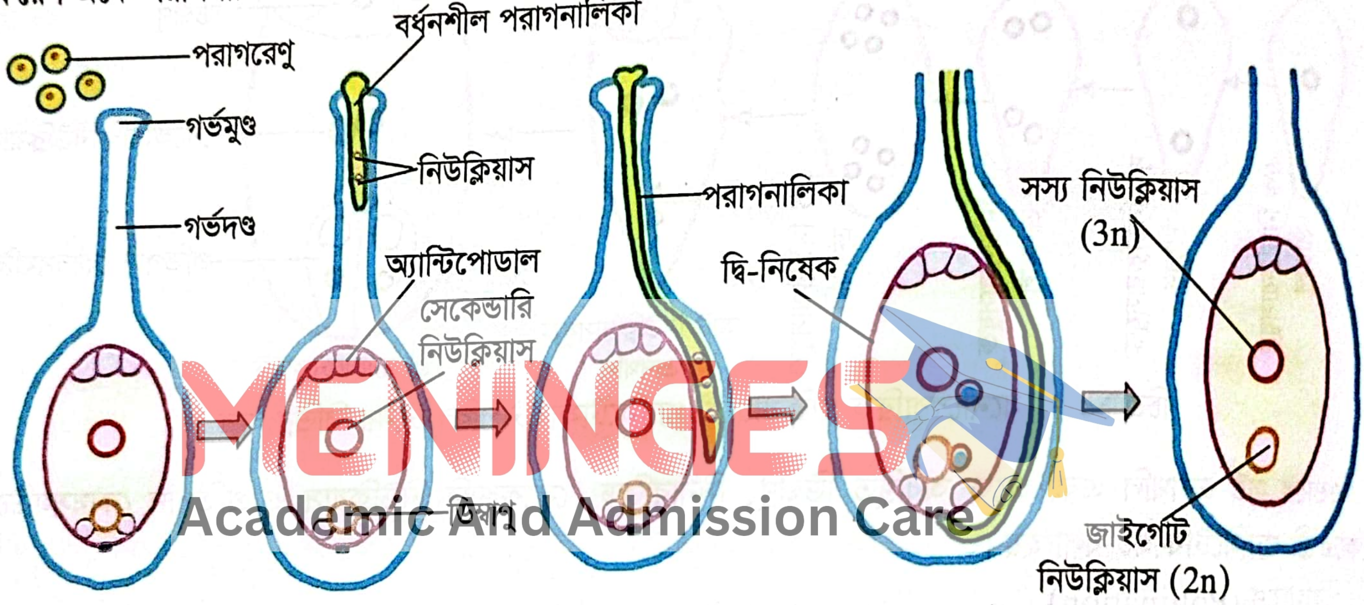

MENINGES Academic And Admission Care

চিত্র ১০.৮ একটি আবৃতবীজী উদ্ভিদের নিষেক কৌশল

(২) **পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী বৃদ্ধি ও শুক্রাণু সৃষ্টি:** পরাগনালিকার অগ্রস্থ সাইটোপ্লাজমে দুটি শুক্রাণু বা পুংগ্যামিট এবং একটি নালি নিউক্লিয়াস থাকে। এগুলোসহ পরাগনালিকা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হয়ে গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ডের টিস্যু ভেদ করে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছায়। এক্ষেত্রে পরাগনালিকা কর্তৃক নিঃসৃত সেলুলেজ (cellulase) ও পেকটিনেজ (pectinase) এনজাইম গর্ভমুণ্ডের ভেতরের কোষ বিগলন করে অগ্রমুখী পরাগনালিকার গমন পথ সৃষ্টি করে।

এরপর পরাগনালিকাটি ডিম্বাশয়ে অবস্থিত ডিম্বকের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে এবং ডিম্বকরন্ধ্র বা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে। পরাগনালিকা ডিম্বকরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করাকে **পরোগ্যামি** (porogamy) বলে। অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদে (যেমন-আম, জাম) পরোগ্যামি ঘটে। পরাগনালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে প্রবেশ করাকে **ক্যালজোগ্যামি** (chalazogamy) বলে। কিছু সংখ্যক (যেমন-ঝাউ) উদ্ভিদে ক্যালজোগ্যামি ঘটে। কিউকারবেসি উদ্ভিদে (যেমন-লাউ ও কুমড়া) পরাগনালিকা ডিম্বক ত্বক ভেদ করে ডিম্বকে প্রবেশ করে। একে মেসোগ্যামি (misogamy) বলে।

(৩) **পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ ও শুক্রাণুর অবমুক্তি:** ডিম্বকের ভ্রূণপোষক টিস্যু ভেদ করে পরাগনালিকাটি ভ্রূণথলির প্রাচীর ভেদ করে পরিশেষে ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে এবং একটি সাহায্যকারী কোষের উপর দিয়ে ডিম্বাণুর নিকট পৌঁছায়। এসময় পরাগনালিকার প্রান্তভাগ বিদীর্ণ হয়ে উহার মধ্যস্থ পুংগ্যামিট দুটি ভ্রূণথলিতে মুক্ত হয়। পরাগনালিকার চাপে একটি বা দুটি সাহায্যকারী কোষ বিনষ্ট হয়ে যায়।

(৪) **ভ্রূণথলিতে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন:** পরাগনালিকা হতে ভ্রূণথলিতে মুক্ত দুটি পুংগ্যামিটের একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে ডিপ্লয়েড জাইগোট গঠনের মাধ্যমে নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। হ্যাপ্লয়েড পুংগ্যামিটের (n) সাথে

৭। ভ্রূণের পরিস্ফুটন (Embryonic development)

নিষেক ভ্রূণথলিতে বিদ্যমান নিষ্ক্রিয় ডিম্বাণুকে পরিস্ফুটনের জন্য সক্রিয় করে তোলে। নিষেকের ফলে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুর (n) সাথে হ্যাপ্লয়েড পুংগ্যামিটের (n) মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়েড কোষ (2n) সৃষ্টি হয় তাকে জাইগোট বা উওস্পোর (zygote or oospore) বলে। এ জাইগোটই হলো স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদের প্রথম কোষ। জাইগোটের চারপাশে একটি আবরণ তৈরি করে কিছু সময় সুপ্তাবস্থায় কাটায়। উদ্ভিদের প্রজাতিভেদে এ সুপ্তিকাল ভিন্ন হয়। সুপ্তিকালের পর ডিপ্লয়েড জাইগোটটি মাইটোসিস বিভাজন ও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বহুকোষী ভ্রূণে পরিণত হয়। অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জাইগোটটি বিভাজিত হয়ে প্রথমে দুটি কোষে পরিণত হয়। এদুটি কোষের মধ্যে ভ্রূণথলির কেন্দ্রের দিকে বিন্যস্ত কোষটিকে প্রান্তকোষ বা শীর্ষকোষ (apical cell) বলে এবং ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে বিন্যস্ত কোষটিকে ভিত্তিকোষ (basal cell) বলে। পরবর্তীতে ধারাবাহিক বিভাজনের মাধ্যমে প্রান্তকোষটি ভ্রূণ (embryo) এবং ভিত্তিকোষটি ভ্রূণধারক (suspensor)-এ পরিণত হয়।

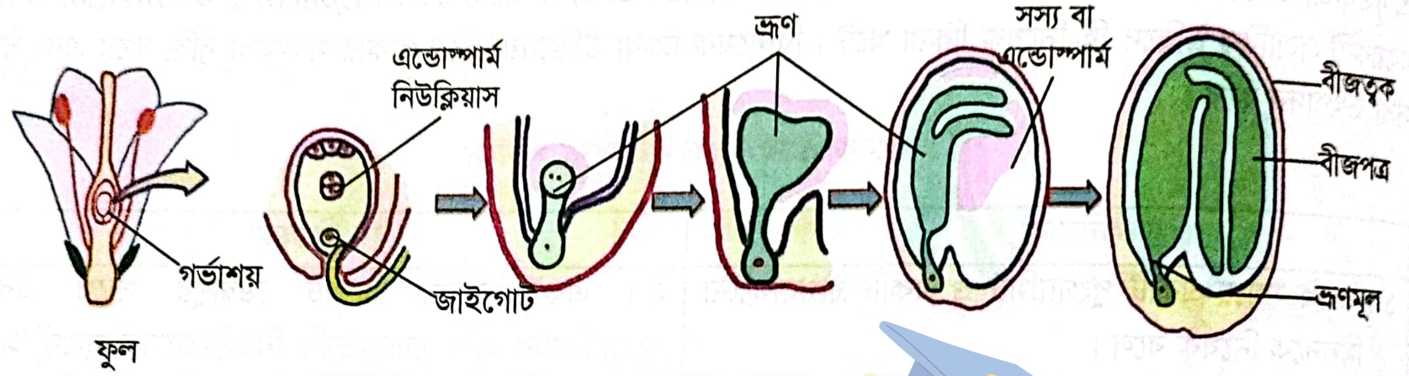

চিত্র ১০.৯ নিষেক পরবর্তী ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন ও বীজ সৃষ্টি

MENINGES Academic And Admission Care

❑ সস্যের সৃষ্টি (Formation of endosperm): নিষেকের সময় সৃষ্ট ট্রিপ্লয়েড সস্য নিউক্লিয়াসটি অবাধ বিভাজন দ্বারা 3n সংখ্যক ক্রোমোসোম বিশিষ্ট সস্য বা এন্ডোস্পার্ম গঠন করে। আবৃতবীজী উদ্ভিদের ডিম্বকে ভ্রূণথলির মধ্যে ভ্রূণ ও সস্যের যুগপৎ পরিস্ফুটন ঘটে। পরিস্ফুটনরত ভ্রূণটি সস্যকলা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এবং এ সস্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভ্রূণের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে লিপিড, প্রোটিন ও স্টার্চ জমা থাকে।

❑ বীজ ও ফল সৃষ্টি (Formation of seed and fruit):: ডিম্বকের অন্তর্গত ভ্রূণথলিতে যখন ভ্রূণের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুটন ঘটতে থাকে তখন ডিম্বকটি বীজে এবং এক বা একাধিক ডিম্বকসহ গর্ভাশয়টি ক্রমশ বর্ধিত হয়ে ফলে পরিণত হয়। বীজের অভ্যন্তরে পূর্ণ বিকশিত ভ্রূণটি বীজপত্র, ভ্রূণমূল ও ভ্রূণকাণ্ড নিয়ে গঠিত থাকে। ভ্রূণ বিকাশের সময় সস্য হতে উহা পুষ্টি লাভ করে। বিকাশরত ভ্রূণ দ্বারা বীজের সস্য সম্পূর্ণরূপে শোষিত হলে সে বীজটি সস্যবিহীন হয় এবং এরূপ বীজকে অসস্যল বীজ (non-endospermic seed) বলে। মটর (*Pisum sativum*), শিম (*Phaselous vulgaris*), আম (*Mangifera indica*), কাঁঠাল (*Artocapus heterophyllus*), সরিষা (*Brassica napus*), সূর্যমুখী (*Helianthus annuus*) ইত্যাদি অসস্যল বীজ। অন্যদিকে বীজে যদি সস্যের কিছু অংশ বিদ্যমান থাকে তাহলে তাকে সস্যল বীজ (endospermic seed) বলে। ধান (*Oryza sativa*), ভুট্টা (*Zea mays*), গম (*Tricum aestivum*), তুলা (*Gossypium herbaceum*) ইত্যাদি সস্যল বীজ। অধিকাংশ আবৃতবীজী উদ্ভিদের বীজের ভ্রূণপোষক টিস্যু বা নিউসেলাস ভ্রূণ কর্তৃক শোষিত হয়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভ্রূণপোষক টিস্যু পরিভ্রূণ বা পেরিস্পার্ম হিসেবে সস্যের বাইরে থেকে যায়।

নিষেকের পর ডিম্বকের নরম ও রসালো ত্বক দুটি কঠিন ও শুষ্ক বীজত্বকে এবং ডিম্বকবৃন্ত বীজবৃন্তে পরিণত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিম্বকবৃন্তটি উপবৃদ্ধিরূপে উদ্ভূত হয়ে বীজের চারদিকে একটি অতিরিক্ত রসালো ত্বকরূপে অবস্থান করে। এরূপ রসালো অতিরিক্ত ত্বককে এরিল (aril) বলে। লিচু (*Litchi chinensis*) ও আঁশফলে এরূপ এরিল দেখা যায়। লিচুর এরিলকে আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি।

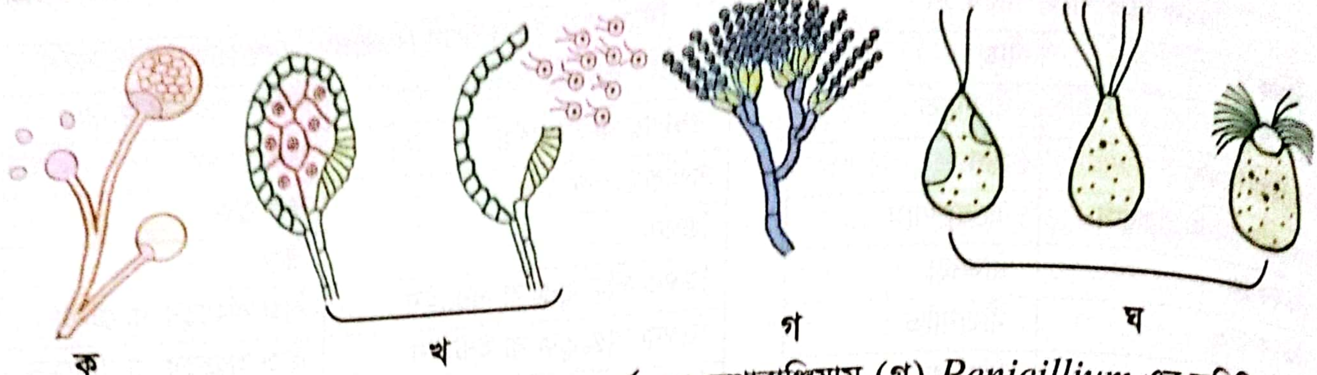

চিত্র ১০.১১ (ক) ছত্রাক -এর স্পোরাঞ্জিয়াম (খ) ফার্ন-এর স্পোরাঞ্জিয়াম (গ) *Penicillium* এর কনিডিয়া এবং (ঘ) শৈবালের বিভিন্ন ধরনের স্পোর

(খ) অঙ্গজ জননের মাধ্যমে: উদ্ভিদ দেহের যে কোনো অঙ্গের মাধ্যমে অঙ্গজ জনন হয়ে থাকে। এটি উদ্ভিদের সাধারণ প্রজনন পদ্ধতি। দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ হতে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। অঙ্গজ জনন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে।

❑ প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন: বেশ কয়েকটি উপায়ে উদ্ভিদের প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন ঘটে, যেমন-

১। খণ্ডক দ্বারা (By fragments): নিম্নশ্রেণির কিছু উদ্ভিদ যেমন, *Spirogyra, Oscillatoria* প্রভৃতি উদ্ভিদের দেহ কোনো কারণে ভেঙ্গে গিয়ে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রতিটি খণ্ড থেকে পরবর্তীতে কোষ বিভাজন দ্বারা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্ট হয়।

MENINGES
Academic And Admission Care

চিত্র ১০.১২ কয়েকটি উদ্ভিদের প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন

২। কুঁড়ি সৃষ্টি দ্বারা (By budding): ঈস্টে মুকুল বা কুঁড়ি সৃষ্টি দ্বারা অঙ্গজ জনন ঘটে। এক্ষেত্রে ঈস্ট কোষের একাংশ ফোলে উঠে এবং এর নিউক্লিয়াস দুভাগে বিভাজিত হয়। বিভাজিত নিউক্লিয়াসের এক অংশ ফোলা অংশে প্রবেশ করে এবং অন্য অংশ মাতৃদেহে থেকে যায়। নিউক্লিয়াসসহ ফোলা অংশটি একসময় মাতৃদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন ঈস্টের জন্ম দেয়।

৩। ভূনিম্নস্থ কাণ্ড দ্বারা (By underground stems): কিছু উদ্ভিদ যেমন- আদা, হলুদ, গোলআলু, ওলকচু, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদির ভূনিম্নস্থ কাণ্ড হতে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়।

৪। রূপান্তরিত মূল দ্বারা (By modified roots): মিষ্টি আলু, কাঁকরোল, ডালিয়া, পটল ইত্যাদি উদ্ভিদের রূপান্তরিত মূল থেকে নির্দিষ্ট ঋতুতে নতুন চারা গজায়।

৫। কৃত্রিম অঙ্গজ জনন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করে অনেক নার্সারিতে বহুলোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

উদ্ভিদের অযৌন ও যৌন জননের মধ্যে পার্থক্য

অযৌন জনন	যৌন জনন
১। জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে না, গ্যামিট সৃষ্টি হয় না।	১। জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে, গ্যামিট সৃষ্টি হয়।
২। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।	২। মাইটোসিস ও মায়োসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়।
৩। জীবনচক্র কিংবা জনুক্রমের সূচনা ঘটে না।	৩। জীবনচক্র কিংবা জনুক্রমের সূচনা ঘটে।
৪। সৃষ্ট উদ্ভিদে কোনো বৈচিত্র্য আসে না।	৪। সৃষ্ট উদ্ভিদে প্রকরণ সৃষ্টি হয় ফলে বৈচিত্র্য আসে।
৫। কোনো জটিল দশা অতিক্রম করে না।	৫। একাধিক জটিল দশা অতিক্রম করে।
৬। একসাথে বহু সংখ্যক উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।	৬। এক সাথে অল্প সংখ্যক উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।
৭। উদ্ভিদের জীবনকাল ক্ষণস্থায়ী হয়।	৭। উদ্ভিদের জীবনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়।
৮। উদ্ভিদে দ্রুত ফল সৃষ্টি হয়।	৮। উদ্ভিদে বিলম্বে ফল সৃষ্টি হয়।
৯। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে অযৌন জনন ঘটে।	৯। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদে যৌন জনন ঘটে।

❑ অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis)

যৌন জননক্ষম উদ্ভিদে সাধারণত দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামিটের (ডিম্বাণু ও শুক্রাণু) মিলনে সৃষ্ট জাইগোটের মাধ্যমে প্রজনন ঘটে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো উদ্ভিদের অনিষিক্ত ডিম্বাণু বিকশিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ জন্ম দেয়। অনিষিক্ত ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ তথা নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংজনি (**parthenogenesis; Gr. *parthenos*=**virgin and *genesis*=origin) বলে। [প্রয়োগ প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পারথেনোকার্পি (Parthenocarpy) বলে। যেমন কমলা লেবু, লেবু ইত্যাদি।]

MENINGES
Academic And Admission Care

প্রকার: উদ্ভিদে দুধরণের পার্থেনোজেনেসিস ঘটে, যথা-

১। হ্যাপ্লয়েড বা আর্হিনোটোকাস পার্থেনোজেনেসিস (Haploid or arrhenotochous parthenogenesis): অনিষিক্ত হ্যাপ্লয়েড গ্যামিট (n) থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্ভিদ সৃষ্টি হলে তাকে হ্যাপ্লয়েড বা আর্হিনোটোকাস পার্থেনোজেনেসিস বলে। *Solanum nigram, Orchis maculata* উদ্ভিদে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুতে পার্থেনোজেনেসিস দেখা যায়। তামাক উদ্ভিদে হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণুতে পার্থেনোজেনেসিস ঘটে। এধরনের প্রজননকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস (androgenesis) বলে।

২। ডিপ্লয়েড বা থেলিটোকাস পার্থেনোজেনেসিস (Diploid or thelytochous parthenogenesis): ত্রুটিপূর্ণ মায়োসিসে সৃষ্ট ডিপ্লয়েড ডিম্বাণুর (2n) মাধ্যমে উদ্ভিদ সৃষ্টি হলে তাকে ডিপ্লয়েড বা থেলিটোকাস পার্থেনোজেনেসিস বলে। *Parthenium, Antennaria* প্রভৃতি উদ্ভিদে ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস দেখা যায়।

কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস (Artificial parthenogenesis)

যেসব ডিম্বাণু বা ডিম থেকে নিষেক প্রক্রিয়ার পর অপত্য জীব সৃষ্টি হয় সেসব ডিম্বাণু বা ডিম থেকে নিষেকের পূর্বে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে পরিস্ফুটন ঘটিয়ে অপত্য জনু সৃষ্টি করা যায়। যে পদ্ধতিতে এ ঘটনা ঘটানো হয় তাকে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস বলে। জীবে সাধারণত দুভাবে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো হয়ে থাকে। যথা-

(ক) ভৌত পদ্ধতি: নিম্নলিখিত উপায়সমূহ দ্বারা ভৌতভাবে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটে-

- তাপমাত্রার বিস্তর পরিবর্তন দ্বারা কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস ঘটানো যায়। অনেকক্ষেত্রে অনিষিক্ত ডিম্বাণুকে 30°C তাপমাত্রা হতে 0C-10°C তাপমাত্রায় স্থানান্তর করলে পার্থেনোজেনেসিস ঘটে যায়।